যার পর দান গ্রহীতাকে কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং সম্পদশালী ও সহিষ্ণু। তিনি কারও অর্থের মুখাপেক্ষী নন। যে ব্যক্তি ব্যয় করে, সে নিজের উপকারের জন্যই করে। অতএব, ব্যয় করার সময় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কারও প্রতি তার অনুগ্রহ নেই, নিজের উপকারের জন্যই সে ব্যয় করছে। দান গ্রহীতার পক্ষ থেকে কোনরূপ অকৃতজ্ঞতা অনুভব করলেও তাকে খোদায়ী রীতির অনুসারী হয়ে ক্ষমা করা দরকার।

চতুর্থ আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই অন্যভাবে আরও তাকীদসহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে, মুখে অনুগ্রহ প্রকাশ করে কিংবা আচার-ব্যবহার দ্বারা কষ্ট দিয়ে স্বীয় দান-খয়রাতকে বরবাদ করো না।

এতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে দান-খয়রাতের পর অনুগ্রহ প্রকাশ কিংবা গ্রহীতাকে কষ্ট দেওয়ার মত কোন কাজ করা হয়, তা বাতিল এবং না করার শামিল। এরূপ দান-খয়রাতে কোন সওয়াব নেই। এ আয়াতে দান কবুল হওয়ার আরও একটি শর্ত বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন মসৃণ পাথরের উপর মাটি জমে যায় এবং তাতে কেউ বীজ বপন করে। অতঃপর এর উপর মুষলধারে বারিপাত হয়। ফলে মাটি কেটে গিয়ে পাথরটি সম্পূর্ণ মসৃণ হয়ে যায়। এরূপ লোক স্বীয় উপার্জন হস্তগত করতে সক্ষম হবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে পথপ্রদর্শন করবেন না। এতে সদকা-খয়রাত কবুল হওয়ার এ শর্ত জানা গেল যে, নির্ভেজাল-ভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পরকালের সওয়াবের নিয়তে ব্যয় করতে হবে—লোক দেখানো কিংবা নামযশের নিয়ত করা যাবে না। নাম-যশের নিয়তে ব্যয় করা ধন-সম্পদ জলাঞ্জলি দেওয়ারই নামান্তর। যদি পরকালে বিশ্বাসী মু'মিনও নাম-যশের উদ্দেশ্যে কোন দান-খয়রাত করে, তবে তার অবস্থাও তদ্রূপ হবে এবং বিনিময়ে কোন সওয়াবই সে পাবে না। এমতাবস্থায় এখানে لا يؤمن بالله যোগ করে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে কাজ করা আল্লাহ্ তা'আলা ও কিয়ামতে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয়। লোক-দেখানো কাজ করা বিশ্বাসের ত্রুটির লক্ষণ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে পথ-প্রদর্শন করবেন না। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার হেদায়েত ও আয়াত সব মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু কাফিররা এ সবের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এর পরিণতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তওফীক তথা সৎকাজের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেন। ফলে তারা কোন হেদায়েত কবুল করে না।

পঞ্চম আয়াতে গ্রহণযোগ্য দান-খয়রাতের একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। যারা স্বীয় ধন-সম্পদকে মনে দৃঢ়তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ কোন টিলায় অবস্থিত বাগানের মত। প্রবল বৃষ্টিপাত না হলেও হালকা বারিবর্ষণই যার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে খুব পরিজ্ঞাত আছেন।

এ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, খাঁটি নিয়ত ও উপরোক্ত শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফযীলত অনেক। সৎ নিয়ত ও আন্তরিকতার সাথে অল্প ব্যয় করলেও তা যথেষ্ট এবং পারলৌকিক ফলাফলের কারণ।

ষষ্ঠ আয়াতে উপরোক্ত শর্তাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে দান-খয়রাত বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিষয়টিও একটি উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ তোমাদের কেউ পছন্দ করবে কি যে, তার একটি আঙুর ও খেজুরের বাগান হবে, বাগানের নিচ দিয়ে পানির নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, বাগানে সব প্রকার ফল থাকবে, সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার দুর্বল ও শক্তিহীন ছেলে সন্তানও বর্তমান থাকবে, এমতাবস্থায় বাগানে অগ্নিবাহী ঘূর্ণিবায়ু এসে হামলা করবে এবং বাগান জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে তোমাদের জন্য নযীর বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

এ হচ্ছে শর্তবিরোধী দান-খয়রাতের উদাহরণ। এরূপ দান-খয়রাতের মাধ্যমে দাতা বাহ্যত পরকালের জন্য অনেক সম্পদ আহরণ করে, কিন্তু আল্লাহ্র কাছে এ সম্পদ কোন কাজেই আসে না।

এ উদাহরণে কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত যোগ করা হয়েছে; অর্থাৎ সে বৃদ্ধ হয়ে গেলে, তার সন্তান-সন্ততিও আছে এবং সন্তানগুলো অল্পবয়স্ক; ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন। এসব শর্তের উদ্দেশ্য এই যে, যৌবনে কারও বাগান ও শস্যক্ষেত্র জ্বলে গেলে সে পুনরায় বাগান করে নেওয়ার আশা করতে পারে; কিংবা যার সন্তান-সন্ততি নেই এবং পুনরায় বাগান করে নেওয়ার আশাও নেই, বাগান জ্বলে যাওয়ার পরও তার পক্ষে জীবিকার ব্যাপারে তেমন চিন্তিত হওয়ার কথা নয়। একটিমাত্র লোকের ভরণ-পোষণ কষ্টেসৃষ্টে হলেও চলে যায়। পক্ষান্তরে যদি সন্তান-সন্ততিও থাকে এবং পিতার কাছে সহযোগিতা ও সাহায্য করার মত বলিষ্ঠ যুবক ও সৎ সন্তান-সন্ততি থাকে, তবুও বাগান ধ্বংস হওয়ার মধ্যে তেমন বেশী চিন্তা ও ব্যথার কারণ নেই। কেননা, সে সন্তান-সন্ততির চিন্তা থেকে মুক্ত। বরং সন্তানেরা তার বোঝাও বহন করতে সক্ষম। মোটকথা, এ তিনটি শর্তই মুখাপেক্ষিতার তীব্রতা বর্ণনা করার জন্য যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ সে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাগান করলো, বাগান তৈরী হয়ে ফলও দিতে লাগলো, এমতাবস্থায় সে বৃদ্ধ হয়ে পড়লো। তার সন্তান-সন্ততিও বর্তমান এবং সন্তানগুলো অল্প বয়স্ক ও দুর্বল। এহেন ঘোর প্রয়োজনের মুহূর্তে যদি তৈরী-বাগান জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তীব্র আঘাত ও অপরিসীম কষ্টেরই কথা। এমনিভাবে যে ব্যক্তি লোক-দেখানোর জন্য সদকা ও খয়রাত করলো, সে যেন বাগান করলো। অতঃপর মৃত্যুর পর সে ঐ বৃদ্ধের মত হয়ে গেল, যে উপার্জন করার কিংবা পুনরায় বাগান করার শক্তি রাখে না। কেননা, মৃত্যুর পর মানুষের সৎ-অসৎ সব কাজকর্মই বন্ধ হয়ে যায়। ছা-পোষা বৃদ্ধ স্বভাবতই অতীত উপার্জন সংরক্ষিত রাখার প্রতি অত্যধিক মুখাপেক্ষী থাকে, যাতে বৃদ্ধ বয়সে তা কাজে লাগে। যদি এমতাবস্থায় তার বাগান ও অর্থ-সম্পদ ধ্বংস হয়ে

যায়, তবে তার দুঃখ-দুর্দশার অবধি থাকবে না। এমনিভাবে লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে কৃত দান-খয়রাত ঘোর প্রয়োজনের মুহূর্তে তার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

পূর্ণ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সদ্‌কা ও খয়রাত আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে ইখলাস অর্থাৎ খাঁটি নিয়তে ও অন্তরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করতে হবে ; নাম-যশের জন্য নয়।

এখন সমগ্র রুকূর সবগুলো আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় ও সদ্‌কা-খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জানা যাবে।

প্রথমত, যে ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হয়, তা হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়ত, সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। তৃতীয়ত, বিশুদ্ধ খাতে ব্যয় করতে হবে। চতুর্থত, খয়রাত দিয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না। পঞ্চমত, যাকে দান করা হবে, তার সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। ষষ্ঠত, যা কিছু ব্যয় করা হয়, খাঁটি নিয়তের সাথে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে—নাম-যশের জন্য নয়।

দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সময় কোন হকদারের হক নষ্ট না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বীয় পোষ্যদের প্রয়োজনীয় খরচাদি তাদের অনুমতি ছাড়া বন্ধ অথবা হ্রাস করে দান-খয়রাত করা কোন সওয়াবের কাজ নয়। অভাবগ্রস্ত ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করে সব ধন-সম্পদ খয়রাত করা কিংবা ওয়াকফ করে দেওয়া সুন্নাহ্‌র শিক্ষার পরিপন্থী। এ ছাড়া আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার হাজারো পন্থা রয়েছে।

সুন্নত দান এই যে, গুরুত্ব ও প্রয়োজনের তীব্রতার দিকে লক্ষ্য রেখে খাত নির্বাচন করতে হবে। ব্যয়কারীরা সাধারণত এ দিকে লক্ষ্য রাখে না।

তৃতীয় শর্তের সারমর্ম এই যে, নিজ ধারণা মতে কোন কাজকে সৎ কাজ মনে করে সেই খাতে ব্যয় করাই সওয়াব হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং খাতটি শরীয়তের বিচারে বৈধ ও পছন্দনীয় কিনা, তা দেখাও জরুরী। যদি কেউ অবৈধ খেলাধুলার জন্য স্বীয় সহায়-সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেয়, তবে সে সওয়াবের পরিবর্তে আযাবের যোগ্য হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়---এমন সব কাজের বেলায় এ কথাই প্রযোজ্য।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم

بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٨﴾ يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ
يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ
اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ
نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ
اَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا
وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ
سَيِّاٰتِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧١﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ
هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ
خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗ
وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٢﴾
لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۖ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ
خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢٧٣﴾ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ
وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٤﴾

(২৬৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না; কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও! জেনে রেখো আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, গুণী। (২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ। (২৬৯) তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান। (২৭০) তোমরা যে খয়রাত বা সদ্ব্যয় কর কিংবা কোন মানত কর, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সেসব কিছু জানেন। অন্যায়কারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২৭১) যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কিছু গোনাহ্ দূর করে দেবেন। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন। (২৭২) তাদেরকে সৎপথে আনার দায় তোমার নয়। বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারার্থে কর। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। (২৭৩) খয়রাত ঐসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ্র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে—জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফিরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাচঞা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত। (২৭৪) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাত্রে এবং দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্য তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন আশংকা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! স্বীয় উপার্জন থেকে উত্তম বস্তু (সৎ কাজে) ব্যয় কর এবং তা (উত্তম বস্তু) থেকে যা আমি তোমাদের (ব্যবহারের) জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি এবং অকেজো বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করো না, অথচ (এমন বস্তুই যদি কেউ তোমাদেরকে প্রাপ্যের বিনিময়ে কিংবা উপঢৌকনরূপে দিতে চায়, তবে) তোমরা কখনও

তা নেবে না; কিন্তু চক্ষু বুঁজে (এবং খাতিরে যদি নিয়ে নাও, তবে ভিন্ন কথা) এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন, (যে, তিনি এমন অকেজো বস্তুতে সন্তুষ্ট হবেন, তিনি) প্রশংসার যোগ্য (অর্থাৎ সত্তা ও গুণাবলীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অতএব তাঁর দরবারে প্রশংসার যোগ্য বস্তুই পেশ করা দরকার)। শয়তান তোমাদিগকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে (অর্থাৎ যদি ব্যয় কর কিংবা উত্তম বস্তু ব্যয় কর, তবে দরিদ্র হয়ে যাবে) এবং তোমাদের মন্দ বিষয়ের (অর্থাৎ কৃপণতার) পরামর্শ দেয় এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে ওয়াদা করেন (ব্যয় করলে এবং উত্তম বস্তু ব্যয় করলে) নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেওয়ার এবং বেশী দেওয়ার (অর্থাৎ সৎকাজে ব্যয় করা যেহেতু ইবাদত এবং ইবাদত গোনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়, তাই ব্যয় দ্বারা গোনাহ্ও মাফ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে দুনিয়াতেই এবং পরকালে সবাইকে ব্যয়ের প্রতিদান বেশী বেশী দান করবেন।) এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচুর্যময় (তিনি সবকিছু দিতে পারেন), সুবিজ্ঞ (নিয়ত অনুযায়ী ফল দান করেন। এসব কথা সুস্পষ্ট, কিন্তু এগুলো সেই বুঝে, যার মধ্যে ধর্মের জ্ঞান রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ধর্মের জ্ঞান দান করেন এবং (সত্য কথা হলো এই যে,) যাকে ধর্মের জ্ঞান দান করা হয় সে বিরাট কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। (কেননা, জগতের কোন নিয়ামত এ নিয়ামতের সমান উপকারী নয়।) বস্তুত উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান (অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী।) তোমরা যে কোন প্রকার ব্যয় কর কিংবা কোন রকম মানত কর, আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই সবকিছু জানেন এবং অন্যায়কারীদের (কিয়ামতে) কোন সাথী (সাহায্যকারী) হবে না। যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবুও ভাল, আর যদি গোপনে কর এবং (গোপনে) অভাবগ্রস্তদেরকে দিয়ে দাও, তবে গোপনে দেওয়া তোমাদের জন্য আরো উত্তম এবং আল্লাহ্ তা'আলা (এর বরকতে) তোমাদের কিছু গোনাহ্ও দূর করে দেবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কৃতকর্মের খুবই খবর রাখেন। (অনেক সাহাবী কাফিরদেরকে এ উদ্দেশে খয়রাত দিতেন যে, সম্ভবত এ কৌশলে কিছু লোক মুসলমান হয়ে যাবে এবং রসূলুল্লাহ্ [সা] ও এ মতই প্রকাশ করেছিলেন। তাই এ আয়াতে উভয় প্রকার সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ঃ হে মুহাম্মদ [সা] তাদেরকে (কাফিরদেরকে) সৎপথে নিয়ে আসা আপনার দায়িত্বে (ফরয-ওয়াজিব) নয় (যে কারণে এত সূক্ষ্ম আয়োজন করতে হবে), কিন্তু (এটি তো) আল্লাহ্ তা'আলা (র কাজ) যাকে ইচ্ছা, সৎপথে নিয়ে আসবেন। (আপনার কাজ শুধু হেদায়েত পৌঁছে দেওয়া---কেউ হেদায়েতে আসুক বা না আসুক। হেদায়েত পৌঁছানো এ নিষেধাজ্ঞার উপর নির্ভরশীল নয় এবং (মুসলমানরা) তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, নিজ উপকারার্থেই কর। (এ উপকারের বর্ণনা এই যে,) তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না (সওয়াব হল দানের অবশ্যম্ভাবী ফল। এ উদ্দেশ্যে যে কোন অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করলে তা অর্জিত হয়। এমতাবস্থায় মুসলমান অভাবগ্রস্তকেই বিশেষভাবে কেন দেওয়া হবে?) এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করছ, তার সবই (অর্থাৎ এর প্রতিদান ও সওয়াব) পুরোপুরি তোমরা (পরকালে) পেয়ে যাবে এবং তোমাদের জন্য মোটেও হ্রাস করা হবে না। (অতএব, প্রতিদানের প্রতিই তোমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রতিদান

সর্বাবস্থায় পাওয়া যাবে। কাজেই তোমাদের এ চিন্তা করা উচিত নয় যে, তোমাদের সদকা মুসলমানরাই পাবে---কাফিররা পাবে না। সদকা-খয়রাতের) প্রকৃত হকদার ঐ সকল গরীব লোক, যারা আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ ধর্মের কাজে) আবদ্ধ হয়ে গেছে (এবং ধর্মের কাজে বন্দী ও মশগুল হওয়ার কারণে) তারা (জীবিকার খোঁজে) দেশের কোথাও চলাফেরা করার (স্বভাবগতভাবে) শক্তি রাখে না (এবং) অজ্ঞ লোকেরা এদেরকেই ধনী মনে করে তাদের যাচ্ঞা থেকে বিরত থাকার কারণে। (তবে) তোমরা তাদেরকে তাদের (লক্ষণ ও) গতি-প্রকৃতি দেখে চিনতে পার। (কেননা, দারিদ্র্য ও উপবাসের কারণে তাদের মুখমণ্ডল ও শরীরে এক প্রকার দুর্বলতা অবশ্যই বিরাজ করে এবং এমনিতেও) তারা মানুষকে পথ আগলিয়ে ভিক্ষা করে না---(যাতে কেউ তাদেরকে অভাবগ্রস্ত বলে মনে করতে পারে। অর্থাৎ তারা ভিক্ষা চায়-ই না। কেননা, যারা চেয়ে অভ্যস্ত, তারা অধিকাংশ সময় পথ আগলিয়েই চায়) এবং (তাদের সেবার জন্য) তোমরা যা ব্যয় করবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা খুব পরিজ্ঞাত। (অন্যদেরকে দেওয়ার চাইতে তাদের সেবার সওয়াব অধিক দেবেন) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাত্রে অথবা দিনে (অর্থাৎ কোন বিশেষ সময় নির্দিষ্ট না করে) গোপনে ও প্রকাশ্যে (অর্থাৎ কোন বিশেষ অবস্থা নির্দিষ্ট না করে) তারা তাদের সওয়াব পাবে (কিয়ামতের দিন) স্বীয় পালনকর্তার কাছে। আর (সেদিন) তাদের কোন বিপদাশঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী রুকূতে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার বর্ণনা ছিল। এখন এর সাথেই সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচ্য রুকূর সাতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا ... ... غَنِيٌّ حَمِيدٌ—শানে-নুযুল

দৃষ্টে طيب শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'উৎকৃষ্ট'। কেউ কেউ দান করার জন্য নিকৃষ্ট বস্তু নিয়ে আসত; এর পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কোন কোন তফসীর-কার শব্দের ব্যাপকতা দৃষ্টে এর অর্থ করেছেন 'হালাল'। কেননা, মাল পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট তখনই হয়, যখন তা হালালও হয়। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতে হালালেরও তাকীদ হবে। তবে প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, খয়রাতের মাল হালাল এবং উৎকৃষ্ট—দু'টোই হওয়া শর্ত। মনে রাখা দরকার যে, আয়াতে উৎকৃষ্ট মাল দেওয়ার নির্দেশ ঐ ব্যক্তির জন্য, যার কাছে উৎকৃষ্ট বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্দ ও নিকৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে ما كسبتم এবং اخرجنا শব্দ দ্বারা বোঝা যায় যে, উৎকৃষ্ট বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। আর لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ বাক্য দ্বারা বোঝা যায় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে অকেজো জিনিস ব্যয় করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির কাছে মূলতই উৎকৃষ্ট বস্তু নেই, সে এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। সে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করলেও গ্রহণীয় হবে।

مَا كَسَبْتُمْ শব্দ থেকে কোন কোন আলেম মাস'আলা চয়ন করেছেন যে, পিতা পুত্রের উপার্জন ভোগ করতে পারে, এটা জায়েয। কেননা, মহানবী (সা) বলেন ঃ

اولادكم من طيب اكسابكم فكلوا من اموال اولادكم هنيئا—

—তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপার্জনের একটি পূত-পবিত্র অংশ। অতএব, তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে সন্তান-সন্ততির উপার্জন ভক্ষণ কর।—(কুরতুবী)

শস্যক্ষেত্রের ওশর-বিধি ঃ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ— বাক্যে

أَخْرَجْنَا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওশরী যমীনে (যে যমীনের উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ ইসলামী বিধান অনুযায়ী সরকারী তহ্‌বিলে জমা দিতে হয়) যে ফসল উৎপন্ন হয়, তার এক-দশমাংশ দান করা ওয়াজিব। আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন যে, ওশরী যমীনে ফসল অল্প হোক বা বেশী হোক ওশর দেওয়া ওয়াজিব। সূরা আন'আমের اٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ আয়াতটি ওশর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশসূচক।

'ওশর' ও 'খেরাজ' ইসলামী শরীয়তের দু'টি পারিভাষিক শব্দ। এ দু'য়ের মধ্যে একটি বিষয় অভিন্ন। উভয়টিই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত কর। পার্থক্য এই যে, 'ওশর' শুধু কর নয়, এতে আর্থিক ইবাদতের দিকটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ; যেমন—যাকাত। এ কারণেই ওশরকে 'যাকাতুল-আরদ' বা ভূমির যাকাতও বলা হয়। পক্ষান্তরে খেরাজ নিরেট কর। এতে ইবাদতের কোন দিক নেই। মুসলমানরা ইবাদতের যোগ্য ও অনুসারী। তাই তাদের কাছ থেকে ভূমির উৎপন্ন ফসলের যে অংশ নেওয়া হয়, তাকে 'ওশর' বলা হয়। অমুসলিমরা ইবাদতের যোগ্য নয়। তাই তাদের ভূমির উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে 'খেরাজ' বলা হয়। যাকাত ও ওশরের মধ্যে কার্যগত আরও পার্থক্য এই যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও পণ্যদ্রব্যের উপর বছরান্তে যাকাত ওয়াজিব হয়, কিন্তু ওশরী জমিনে উৎপাদনের সাথেই ওশর ওয়াজিব হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, জমিনে ফসল উৎপন্ন না হলে ওশর দিতে হয় না। কিন্তু পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্যে মুনাফা না হলেও বছরান্তে যাকাত ফরয হবে। ওশর ও খেরাজের বিস্তারিত মাস'আলা বর্ণনার স্থান এটা নয়। ফিকহ্ গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ... ... وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُوا الْاَلْبَابِ-

যখন কারও মনে এ ধারণা জন্মে যে, দান-খয়রাত করলে ফকীর হয়ে যাবে, বিশেষত আল্লাহ্ তা'আলার তাকীদ শুনেও স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করার সাহস না হয় এবং খোদায়ী ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানী ওয়াদার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নেওয়া উচিত যে, এ প্ররোচনা শয়তানের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এখানে এরূপ বলা ঠিক নয় যে, আমরা তো শয়তানের চেহারাও দেখিনি---প্ররোচনা ও নির্দেশ নেওয়া দূরের কথা। পক্ষান্তরে যদি মনে ধারণা জন্মে যে, সদ্‌কা-খয়রাত করলে গোনাহ্ মাফ হবে এবং ধন-সম্পদও বৃদ্ধি পাবে ও বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে, এ বিষয়টি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি সবার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং নিয়ত ও কর্ম সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

হেকমতের অর্থ ও ব্যাখ্যা ঃ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ—'হেকমত' শব্দটি কোরআন পাকে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতে তফসীরকারকগণের এ সম্পর্কিত প্রায় ত্রিশটি উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে ঃ প্রকৃতপক্ষে এগুলো প্রায় কাছাকাছি উক্তি। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই, অভিব্যক্তির পার্থক্য মাত্র। حكمة শব্দটি احكام-এর ধাতু। এর অর্থ কোন কর্ম অথবা উক্তিকে তার গুণাবলীসহ পূর্ণ করা।

এ কারণেই বাহ্‌রে-মুহীতে হযরত দাউদ (আ) সম্পর্কিত সূরা বাক্বারার اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ—আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

والحكمة وضع الامور فى محلها على الصواب وكمال ذالك انما يحصل بالنبوة ـ

---হেকমতের আসল অর্থ প্রত্যেক বস্তুকে যথাস্থানে স্থাপন করা। এর পূর্ণত্ব শুধুমাত্র নবুয়তের মাধ্যমেই সাধিত হতে পারে। তাই এখানে হেকমত বলতে নবুয়ত বোঝান হয়েছে।

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে বলেন ঃ হেকমত শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হবে সমগ্র বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান এবং নিখুঁত আবিষ্কার। অন্যের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হয় সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তদনুযায়ী কর্ম।

এ অর্থটিই বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোথাও এর অর্থ নেওয়া হয়েছে কোরআন, কোথাও হাদীস, কোথাও বিশুদ্ধ জ্ঞান, কোথাও সৎকর্ম, কোথাও সত্য কথা, কোথাও সুস্থ বুদ্ধি, কোথাও ধর্মের বোধ, কোথাও মতামতের নির্ভুলতা এবং

কোথাও আল্লাহ্‌র ভয়। শেষোক্ত অর্থটি স্বয়ং হাদীসে উল্লিখিত আছে। বলা হয়েছে رأس الحكمة خشية الله —অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়ই প্রকৃত হেকমত। وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ আয়াতে হেকমতের ব্যাখ্যা সাহাবী ও তাবেতাবেয়ীগণ কর্তৃক হাদীস ও সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, আলোচ্য يؤت الحكمة আয়াতে পূর্ববর্ণিত সবগুলো অর্থই বোঝানো হয়েছে।---(বাহ্‌রে-মুহীত, ৩২০ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ড)

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ এ উক্তিই শব্দটির সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট অর্থবোধক। أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا বাক্য থেকেও এর দিকে ইশারা বোঝা যায়। কারণ, এর অর্থ হচ্ছে, যাকে হেকমত দেওয়া হয়েছে, তাকে প্রভূত মঙ্গল ও কল্যাণ দেওয়া হয়েছে।

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَّفَقَةٍ ... ... وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ

কোন প্রকার ব্যয় বলতে সর্বপ্রকার ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে; যে ব্যয়ে সব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং যে ব্যয়ে সবগুলোর কিংবা কতকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। উদাহরণত আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হয়নি বরং গোনাহ্‌র কাজে ব্যয় করা হয়েছে, কিংবা লোক দেখানো ব্যয় করা হয়েছে অথবা ব্যয় করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে কিংবা হালাল ও উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করা হয়নি ইত্যাদি, সর্বপ্রকার ব্যয়ই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে 'মানত' শব্দের ব্যাপকতায় সর্বপ্রকার মানতই এসে গেছে। উদাহরণত আর্থিক ইবাদতের মানত। এ সাদৃশ্যের কারণেই ব্যয়ের সাথে মানতের উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দৈহিক ইবাদতের মানত; তা আবার শর্তহীন হোক কিংবা শর্তযুক্ত হোক, তা পূর্ণ করা হোক বা না করা হোক, ইত্যাদি সর্বপ্রকার মানতই আয়াতে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রকার ব্যয় ও সর্বপ্রকার মানত সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত। তিনি এগুলোর প্রতিদানও দেবেন। সীমা ও শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে উৎসাহিত করা এবং লক্ষ্য না রাখার জন্য ভীতি-প্রদর্শন করার লক্ষ্যেই একথা শোনানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাদেরকে স্পষ্টভাবে শাস্তিবাণী শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে।

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ... ... وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

বাহ্যত এ আয়াতে ফরয ও নফল সব রকম দান-খয়রাতকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রকার দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই উত্তম। এতে ধর্মীয় ও জাগতিক

উভয় প্রকার উপকারিতাই বর্তমান রয়েছে। ধর্মীয় উপকারিতা এই যে, এতে রিয়া তথা লোক-দেখানোর সম্ভাবনা নেই এবং দান গ্রহণকারীও লজ্জিত হয় না। জাগতিক উপকারিতা এই যে, স্বীয় অর্থের পরিমাণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। গোপনীয়তা উত্তম হওয়ার মানে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম হওয়া। সুতরাং অপবাদ খণ্ডন করা, অন্যে তা অনুসরণ করবে এরূপ আশা করা ইত্যাদি কারণে যদি কোন স্থলে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম বিবেচিত হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়।

يُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم—গোপনে দান করার সাথেই গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা সম্পর্কযুক্ত নয়---শুধু এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য গোপনীয়তার পার্শ্বে একে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ গোপন দান করার মধ্যে যদি তুমি কোন বাহ্যিক উপকার না দেখ, তবে বিষণ্ন হওয়া উচিত নয়। কেননা, তোমার গোনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করবেন। এটা তোমার বিরাট উপকার।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ... ...وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ—এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতে আসলে তোমাদের নিয়তও থাকে নিজেদেরই উপকার লাভ করা এবং বাস্তবেও এর দ্বারা বিশেষভাবে তোমাদেরই উপকার হবে। এমতাবস্থায় দান-খয়রাত করলে তা শুধুমাত্র মুসলমানকেই দেবে---কাফিরকে দেবে না, এ বিশেষ পথে এ উপকার লাভ করতে চাও কেন? এটি অতিরিক্ত বিষয়। এর প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়।

এখানে আরও বুঝে নেওয়া দরকার যে, এ সদ্‌কা অর্থ নফল সদ্‌কা, যা যিম্মী কাফিরকেও দেওয়া জায়েয। এখানে সদকা বলতে ফরয সদকা বোঝান হয়নি। ফরয সদকা মুসলমান ছাড়া কাউকে দেওয়া জায়েয নয়---(মাযহারী)

মাস'আলা ঃ দারুল-হরবের কাফিরদেরকে কোন প্রকার দান-খয়রাত দেওয়া জায়েয নয়।

মাস'আলা ঃ যিম্মী কাফির অর্থাৎ যে দারুল-হরবের নয়, তাকে শুধু যাকাত ও ওশর দান করা জায়েয নয়। অন্য সব ওয়াজিব ও নফল সদ্‌কা দান করা জায়েয। আলোচ্য আয়াতে যাকাত অন্তর্ভুক্ত নয়।

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... ... فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ০

এখানে ফকীর বলতে ঐ সকল লোককে বোঝান হয়েছে, যারা ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন কাজ করতে পারে না।

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ—এ আয়াত থেকে জানা যায়

যে, কোন ফকীরকে যদি মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়, তবে এ কারণে তাকে ধনী মনে করা হবে না; বরং ফকীরই বলা হবে। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত দান করাও দুরস্ত হবে। —(কুরতুবী)

تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ—এতে বোঝা যায় যে, লক্ষণাদি দেখে বিচার করা অশুদ্ধ নয়। কাজেই যদি এমন কোন বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া যায়, যার দেহে পৈতা আছে এবং সে খতনাকৃতও নয়, তবে তাকে মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না।— (কুরতুবী)

لَا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا—এ আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, তারা পথ আগলিয়ে সওয়াল করে না। কিন্তু পথ না আগলিয়েও সওয়াল করে না—এরূপ বোঝা যায় না। কোন কোন তফসীরকার তাই বলেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরকারদের মতে এর অর্থ এই যে, তারা মোটেই সওয়াল করে না—لا نهم متعففون عن المسئلة কারণ, তারা সওয়াল করা থেকে নিজেদেরকে পুরোপুরি নিরাপদ দূরত্বে রাখে।—(কুরতুবী)

اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ—এ সপ্তম আয়াতে ঐ সকল লোকের বিরাট প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা রাতে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতের জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, দিবারাত্রিরও কোন প্রভেদ নেই। এমনিভাবে গোপন ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, খাঁটি নিয়তে দান করতে হবে। নাম-যশের নিয়ত থাকলে চলবে না। প্রকাশ্যে ব্যয় করার কোন প্রয়োজন দেখা না দেওয়া পর্যন্তই গোপনে দান করার শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ। যেখানে এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয়।

ইবনে-আসাকের-এর বরাত দিয়ে রূহুল-মা'আনীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) একবার দশ হাজার দিরহাম দিনে, দশ হাজার দিরহাম রাতে, দশ হাজার দিরহাম গোপনে ও দশ হাজার দিরহাম প্রকাশ্যে—এভাবে মোট চল্লিশ হাজার দিরহাম আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেন। কোন কোন তফসীরকার হযরত আবূ বকর (রা)-এর এ ঘটনাকে আয়াতের শানে-নযুল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ আয়াতের শানে-নযুল সম্পর্কে আরও বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۭ فَمَنْ
جَاۗءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۭ وَاَمْرُهٗٓ
اِلَى اللّٰهِ ۭ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ۝ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ
تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۝ وَاِنْ كَانَ
ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۭ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۡ
ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

(২৭৫) যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে ঃ ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেওয়ারই মত! অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার

পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (২৭৬) আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে। (২৭৭) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্য তাদের পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (২৭৮) হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকে। (২৭৯) অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না। (২৮০) যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (২৮১) ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে! অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা সুদ খায় (অর্থাৎ গ্রহণ করে), তারা (কিয়ামতের দিন কবর থেকে) দণ্ডায়মান হবে না, কিন্তু যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয় (অর্থাৎ হতবুদ্ধি মাতালের মত দণ্ডায়মান হবে)। এ শাস্তির কারণ এই যে, এরা (অর্থাৎ সুদখোরেরা সুদের বৈধতা প্রমাণ করার জন্য) বলেছিল ঃ ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদের মত (কেননা, এতেও মুনাফা অর্জন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই বৈধ। কাজেই অনুরূপ যে সুদ, তাও বৈধ হওয়া উচিত)। অথচ (উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবধান রয়েছে। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা (যিনি বিধি-বিধানের মালিক) ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন; (এর বেশী ব্যবধান আর কি হতে পারে?) অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (এ সম্পর্কে) উপদেশ এসেছে এবং সে (এই সুদখোরী কুফরী বাক্য অর্থাৎ সুদকে বৈধ বলা থেকে) বিরত হয়েছে (এবং তাকে হারাম মনে করে সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ করছে, তার জন্য রয়েছে সুসংবাদ)। তবে যা কিছু (এ নির্দেশ নাযিলের) পূর্বে (নেওয়া) হয়ে গেছে, তা তার (অর্থাৎ বাহ্যিক শরীয়তে তার এ তওবা কবুল হয়েছে এবং নেওয়া অর্থের মালিক সেই) এবং তার (অভ্যন্তরীণ) ব্যাপার (অর্থাৎ সে মনেপ্রাণে বিরত হয়েছে, না কপটতা করে তওবা করেছে, তা)

আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। (খাঁটি মনে তওবা করে থাকলে তা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণ-যোগ্য হবে, নতুবা না করার মতই হবে। তার প্রতি কুধারণা পোষণ করার অধিকার তোমাদের নেই)। এবং যারা (উল্লিখিত উপদেশ শুনেও এ উক্তি ও কর্মের দিকে) পুনরায় ফিরে আসে, তবে (তাদের এ কাজ স্বয়ং কবীরা গোনাহ্‌ তথা মহাপাপ হওয়ার কারণে) তারা দোযখে যাবে (এবং তাদের এ উক্তি কুফরী হওয়ার কারণে) তারা তথায় (দোযখে) চিরকাল অবস্থান করবে। (সুদ গ্রহণে আপাত দৃষ্টিতে টাকা-পয়সা বৃদ্ধি পেতে দেখা গেলেও পরিণামে) আল্লাহ্‌ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। (কখনও ইহকালেই সব ধ্বংস হয়ে যায়, নতুবা পরকালে ধ্বংস হওয়া তো সুনিশ্চিত। কেননা, সেখানে এ কারণে শাস্তি প্রদান করা হবে। এর বিপরীতে দান-খয়রাতে আপাত দৃষ্টিতে অর্থ হ্রাস পায় মনে হলেও পরিণামে) আল্লাহ্‌ তা'আলা দানকে বর্ধিত করেন। (কখনও ইহকালেই বৃদ্ধি করেন, নতুবা পরকালে বৃদ্ধি পাওয়া তো সুনিশ্চিত। কেননা, সেখানে এ কারণে অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে; যেমন পূর্বোল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে)। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা পছন্দ করেন না (বরং অপছন্দ করেন,) কোন অবিশ্বাসীকে, (যে উপরোক্ত বাক্যের মত কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে এবং এমনিভাবে পছন্দ করেন না) কোন পাপীকে (যে উল্লিখিত কাজ অর্থাৎ সুদের অনুরূপ কবীরা গোনাহ করে)।

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, (বিশেষত) নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে সওয়াব রয়েছে এবং (পরকালে) তাদের কোন বিপদাশঙ্কা হবে না এবং তারা (কোন উদ্দেশ্য পণ্ড হওয়ার কারণে) দুঃখিতও হবে না।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যেসব বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকে। (কেননা, আল্লাহ্‌র আনুগত্য করাই ঈমানের দাবী।) অতঃপর যদি তোমরা (একে কার্যে পরিণত) না কর, তবে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের বিজ্ঞপ্তি শুনে নাও (অর্থাৎ তোমাদের বিরুদ্ধে এ কারণে জিহাদ ঘোষণা করা হবে) এবং যদি তোমরা তওবা করে নাও, তবে তোমাদের মূলধন (ফেরত) পেয়ে যাবে। (এ আইনের পর) তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করতে পারবে না, তোমাদের প্রতিও অত্যাচার করা হবে না। (অর্থাৎ তোমরা মূলধনও ফেরত পাবে না বা দিবে না, তা হবে না) এবং যদি (ঋণগ্রহীতা) অভাবগ্রস্ত হয় (এবং এ কারণে নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারে,) তবে (তাকে) সময় দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে, সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত। (অর্থাৎ যখন সে পরিশোধ করতে সক্ষম হবে সে সময় পর্যন্ত)। এবং (সম্পূর্ণভাবে) ক্ষমা করে দেওয়াই তোমাদের জন্য আরও উত্তম, যদি তোমরা (এ সওয়াব ও বিনিময় সম্পর্কে) জ্ঞানবান হও।

(হে মুসলমানগণ,) ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে হাযিরার জন্য প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্ম (অর্থাৎ কৃতকর্মের ফল) পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না (অতএব হাযিরার জন্য তোমরা স্বীয় কার্যকলাপ ঠিক রাখ এবং কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করো না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে 'রিবা' অর্থাৎ সুদের অবৈধতা ও তার বিধি-বিধান সম্পর্কিত বর্ণনা শুরু হয়েছে। এ প্রশ্নটি কয়েক দিক দিয়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে সুদের কারণে কোরআন ও সুন্নায় কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে সুদ বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। সুদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করার পথে যেসব অসুবিধা ও জটিলতা বিদ্যমান, সেগুলোর তালিকা সুদীর্ঘ। তাই বিষয়টি কয়েক দিক দিয়েই আলোচনা সাপেক্ষ।

প্রথমে এ ব্যাপারে কোরআনী আয়াতের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও সহীহ্ হাদীসসমূহের বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সুদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে এবং দেখতে হবে সুদ কোন্ কোন্ ব্যবসায়-বাণিজ্যে পরিব্যাপ্ত, এর অবৈধতা কোন্ রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল এবং এতে কি ধরনের অনিষ্ট বিদ্যমান?

সুদের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে যৌক্তিক ও অর্থনৈতিক। অর্থাৎ বাস্তবিকই কি সুদ বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতির নিশ্চয়তা দিতে পেরেছে? একে উপেক্ষা করলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাধারণ অর্থনীতির প্রাচীর কি ধসে যাবে, না গোটা ব্যাপারটাই শুধু আল্লাহ্ ও পরকালে অবিশ্বাসী মস্তিষ্কসমূহের উদ্ভট ফসল? নতুবা সুদ ছাড়াও সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে—শুধু সমস্যার সমাধানই নয়; বরং বিশ্বের অর্থনৈতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুদ বর্জনের উপরই নির্ভরশীল, সুদই বিশ্বের অর্থনৈতিক অশান্তি ও অস্থিরতার মূল ও প্রধান কারণ?

দ্বিতীয়ত, এই আলোচনাটি একটি অর্থনৈতিক বিষয়। এর আওতায় অনেকগুলো মৌলিক ও আনুষঙ্গিক সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। কোরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এসব আলোচনাও কম দীর্ঘ নয়।

আলোচ্য ছয়টি আয়াতে সুদের অবৈধতা ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যে সুদখোরদের মন্দ পরিণতি এবং হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্ছনা ও ভ্রষ্টতার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা সুদ খায়, তারা দণ্ডায়মান হয় না; কিন্তু সেই ব্যক্তির মত, যাকে কোন শয়তান-জ্বিন আসর করে দিশেহারা করে দেয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হাশরের ময়দানে কবর থেকে উঠা। সুদখোর যখন কবর থেকে উঠবে, তখন ঐ পাগল বা উন্মাদের মত উঠবে, যাকে কোন শয়তান-জ্বিন দিশেহারা করে দেয়।

এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, জ্বিন ও শয়তানের আসরের ফলে মানুষ অজ্ঞান কিংবা উন্মাদ হতে পারে। অভিজ্ঞ লোকদের উপর্যুপরি অভিজ্ঞতাও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। হাকীম ইবনে কাইয়্যেম জওযী (র) লিখেছেন ঃ চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকগণও স্বীকার করেন যে, মৃগীরোগ, মূর্ছারোগ কিংবা পাগলামি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। মাঝে মাঝে জ্বিন ও শয়তানের আসরও এর কারণ হয়ে থাকে। যারা বিষয়টি অস্বীকার করে, তাদের কাছে বাহ্যিক অসম্ভাব্যতা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ বর্তমান নেই।

আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সুদখোররা হাশরে উন্মাদ অবস্থায় উত্থিত হবে—কোরআন পাক সোজাসুজি একথা বলেনি, বরং পাগলামি ও অজ্ঞানতার বিশেষ একটি প্রকার উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ, শয়তান আসর করে দিশেহারা করে দিলে যেভাবে উঠে, সেভাবে উঠবে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, অজ্ঞান ও পাগল ব্যক্তি মাঝে মাঝে যেমন চুপচাপ পড়ে থাকে তাদের অবস্থা তেমন হবে না ; তারা শয়তান কর্তৃক মাতাল করা লোকদের মত প্রলাপোক্তি ও অন্যান্য পাগলসুলভ কাণ্ড-কীর্তি দ্বারা পরিচিত হবে।

সম্ভবত এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, রোগবশত অজ্ঞান কিংবা পাগল হওয়ার পর চেতনা শক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। এরূপ ব্যক্তিই কষ্ট কিংবা শাস্তি অনুভব করতে পারে না। সুদখোরদের অবস্থা এরূপ হবে না। তারা ভূতে-ধরা লোকের মত কষ্ট ও শাস্তি পুরোপুরিই অনুভব করবে।

এখন দেখতে হবে যে, অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে যে মিল থাকা দরকার, তা এখানে আছে কিনা। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে শাস্তি কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে কোন অপরাধের কারণে দেওয়া হয়, তার সাথে অপরাধের অবশ্যই মিল থাকে। হাশরে সুদখোরদেরকে মাতাল অবস্থায় উত্থিত করার মধ্যে সম্ভবত এ বিষয়ের অভিব্যক্তি রয়েছে যে, সুদখোর টাকা-পয়সার লালসায় এমন বিভোর হয়ে পড়ে যে, কোন দরিদ্রের প্রতি তার মনে সামান্য দয়ারও উদ্রেক হয় না। এবং লজ্জা-শরম তাকে বাধা দিতে পারে না। সে প্রকৃতপক্ষে জীবদ্দশায় অজ্ঞান ছিল। তাই হাশরেও তাকে এ অবস্থায় উঠানো হবে। অথবা এ শাস্তি দেওয়ার কারণ এই যে, সে যেহেতু দুনিয়াতে স্বীয় নির্বুদ্ধিতাকে বুদ্ধির আবরণে প্রকাশ করেছে এবং ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ আখ্যা দিয়েছে, তাই তাকে নির্বোধ করে উঠান হবে।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ এর অর্থ হচ্ছে সুদ গ্রহণ করা ও সুদ ব্যবহার করা খাওয়ার জন্য ব্যবহার করুক কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী অথবা আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করুক। কিন্তু বিষয়টি 'খাওয়া' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই যে, যে বস্তু খেয়ে ফেলা হয়, তা আর ফেরত দেওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অন্য রকম ব্যবহারে ফেরত দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পুরোপুরি আত্মসাৎ করার কথা বোঝাতে গিয়ে 'খেয়ে ফেলা' শব্দ দ্বারা বোঝান হয়। শুধু আরবী ভাষা নয়, অধিকাংশ ভাষার সাধারণ বাকপদ্ধতিও তাই।

এরপর দ্বিতীয় বাক্যে সুদখোরদের এ শাস্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে। তারা দু'টি অপরাধ করেছে ঃ এক, সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে। দুই, সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা একে হারাম বলেছে, তাদের উত্তরে বলেছে ঃ "ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই অনুরূপ। সুদের মাধ্যমে যেমন মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও মুনাফাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব, সুদ হারাম হলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো হারাম হওয়া উচিত।" অথচ কেউ বলে না যে, ক্রয়-বিক্রয় হারাম। এক্ষেত্রে বাহ্যত তাদের বলা উচিত ছিল যে, সুদও তো ক্রয়-বিক্রয়ের মতই। ক্রয়-বিক্রয় যখন হালাল তখন সুদও হালাল হওয়া

উচিত। কিন্তু তারা বর্ণনাভঙ্গি পাল্টিয়ে যারা সুদকে হারাম বলতো, তাদের প্রতি এক প্রকার উপহাস করেছে যে, তোমরা সুদকে হারাম বললে ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম বল।

তৃতীয় বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ উক্তির জওয়াবে বলেছেন যে, এরা ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ ও সমতুল্য বলেছে, অথচ আল্লাহ্র নির্দেশের ফলে এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা একটিকে হালাল এবং অপরটিকে হারাম করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় উভয়টি কেমন করে সমতুল্য হতে পারে?

এর জওয়াবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সুদখোরদের আপত্তি ছিল যুক্তিগত। অর্থাৎ মুনাফা উপার্জনই যখন উভয় লেনদেনের লক্ষ্য, তখন হারাম-হালালের ব্যাপারে উভয়টি একই রকম হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের যুক্তিনির্ভর আপত্তির জওয়াব যুক্তিগতভাবে পার্থক্য বর্ণনার মাধ্যমে দেন নি; বরং বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে জওয়াব দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সব কিছুর একমাত্র অধিপতি এবং বস্তুর লাভ-ক্ষতি ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি যখন একটিকে হালাল ও অপরটিকে হারাম করেছেন, তখন এতেই বুঝে নেওয়া যায় যে, তিনি যে বস্তুকে হারাম করেছেন, তার মধ্যে অবশ্যই কোন অনিষ্ট, ক্ষতি বা অপবিত্রতা রয়েছে—সাধারণ মানুষ তা অনুভব করুক বা নাই করুক। কেননা, সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার পূর্ণ স্বরূপ ও লাভ-ক্ষতি পুরোপুরিভাবে একমাত্র ঐ মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞই জানতে পারেন যার জ্ঞান থেকে পৃথিবীর কণা পরিমাণ বস্তুও লুক্কায়িত নয়। বিশ্বের ব্যক্তিবর্গ ও সম্প্রদায়সমূহ নিজ নিজ লাভ-ক্ষতি জানতে পারলেও সমগ্র বিশ্বের লাভ-লোকসান পুরোপুরিভাবে জানতে পারে না। কোন কোন বস্তু কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের পক্ষে লাভজনক হয় কিন্তু গোটা জাতি কিংবা গোটা দেশের জন্য তাতে ক্ষতি নিহিত থাকে।

এরপর তৃতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি সুদের অর্থ অর্জন করেছিল, সুদ হারাম হওয়ার পর সে যদি ভবিষ্যতের জন্য তওবা করে নেয় এবং সুদ থেকে বিরত থাকে, তবে পূর্বেকার সঞ্চিত অর্থ শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী তারই অধিকারভুক্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, সে সর্বান্তকরণেই বিরত রয়েছে কি কপটতা সহকারে তওবা করেছে—তার এ অভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল থাকবে।

মনে-প্রাণে তওবা করে থাকলে আল্লাহ্র কাছে তা উপকারী হবে, অন্যথায় তা তওবা না করারই মত। তার প্রতি সাধারণ লোকদের খারাপ ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। যে উপদেশ শুনেও উপরোক্ত উক্তি ও কার্যে পুনরায় লিপ্ত হয়, তার এ কার্যে (সুদ গ্রহণ করা) গোনাহ্ হওয়ার কারণে সে দোযখে যাবে এবং তার এ উক্তিতে (অর্থাৎ সুদ ক্রয়-বিক্রয়েরই মত হালাল) কুফর হওয়ার কারণে সে চিরকাল দোযখে অবস্থান করবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। এখানে একটি বিশেষ সামঞ্জস্যের কারণে সুদের সাথে দান-খয়রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সুদ ও খয়রাত উভয়ের স্বরূপ যেমন পরস্পর-বিরোধী, উভয়ের পরিণামও তেমনি পরস্পরবিরোধী। আর সাধারণত যারা এসব কাজ করে, তাদের উদ্দেশ্য এবং নিয়তও পরস্পরবিরোধী হয়ে থাকে।

স্বরূপের বিরোধ এই যে, সদকা ও খয়রাতে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই নিজ অর্থ-সম্পদ অপরকে দেওয়া হয় এবং সুদে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই অপরের অর্থ-সম্পদ নিয়ে নেওয়া হয়। এ দু'টি কাজ যারা করে, তাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্য পরস্পরবিরোধী হওয়ার কারণ এই যে, খয়রাতকারী ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও পরকালীন সওয়াবের জন্য স্বীয় অর্থ-সম্পদ হ্রাস কিংবা নিঃশেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পক্ষান্তরে সুদ গ্রহণকারী ব্যক্তি তার বর্তমান অর্থ-সম্পদকে অবৈধভাবে বৃদ্ধি করার উদগ্র বাসনা পোষণ করে থাকে। পরিণতির পরস্পর বিরোধিতা কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সুদ দ্বারা অর্জিত ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত মিটিয়ে দেন এবং খয়রাতকারীর ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত বাড়িয়ে দেন। সারকথা এই যে, যারা ধন-সম্পদের লোভ করে না, সম্পদ হ্রাসে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ধন-সম্পদ কিংবা ধন-সম্পদের ফলাফল, বরকত ও উপকারিতা বেড়ে যায়।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদকে মেটানো আর দান-খয়রাতকে বর্ধিত করার উদ্দেশ্য কি? কোন কোন তফসীরকার বলেন, এ মেটানো ও বাড়ানো পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুদখোরের ধন-সম্পদ পরকালে তার কোনই কাজে আসবে না; বরং তা তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে দান-খয়রাতকারীদের ধন-সম্পদ পরকালে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নিয়ামত ও শান্তিলাভের উপায়-উপকরণ হবে। এ ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট। এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সাধারণ তফসীরকারগণ বলেন ঃ সুদকে মেটানো এবং দান-খয়রাতকে বাড়ানো পরকালে তো হবেই, কিন্তু এর কিছু কিছু লক্ষণ দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা যায়।

যে সম্পদের সাথে সুদ মিশ্রিত হয়ে যায়, অধিকাংশ সময় সেগুলো তো ধ্বংস হয়ই, অধিকন্তু আগে যা ছিল, তাও সাথে নিয়ে যায়। সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায়। অজস্র পুঁজির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে দেউলিয়া ও ফকীরে পরিণত হয়। সুদবিহীন ব্যবসা-বাণিজ্যেও লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্তও হয়; কিন্তু গতকাল যে কোটিপতি ছিল, আজ সে পথের ভিখারী, এমন ক্ষতি শুধু সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। লোক সমাজে অসংখ্য বর্ণনা বিবৃতি এ ব্যাপারে সুবিদিত যে, সুদের মাল তাৎক্ষণিকভাবে যতই প্রবৃদ্ধি লাভ করুক না কেন, তা সাধারণত স্থায়ী হয় না। সন্তান-সন্ততি ও বংশধররা তা ভোগ করতে পারে না। প্রায়ই কোন-না-কোন বিপর্যয়ের মুখে তা ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত মা'মার (র) বলেন ঃ আমি বুযুর্গদের মুখে শুনেছি, চল্লিশ বছর যেতে না যেতেই সুদখোরের ধন-সম্পদে ভাটা আরম্ভ হয়ে যায়।

যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধন-সম্পদের ধ্বংস দেখা নাও যায়, তবুও তার উপকারিতা, বরকত ও ফলাফল থেকে বঞ্চনা নিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী। কেননা এটা সুস্পষ্ট যে, স্বর্ণ-রৌপ্য স্বয়ং উদ্দেশ্যও নয় এবং উপকারীও নয়। স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা কারও ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটে না, কিংবা শীত গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তা গায়ে জড়ানো কিংবা বিছানোও যায় না। তদুপরি এর উপার্জন ও সংরক্ষণে হাজারো কষ্ট স্বীকার করতে হয়। একজন

বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতে এত সব কষ্ট স্বীকার করার কারণ এছাড়া অন্য কিছু নয় যে, স্বর্ণ-রৌপ্য এমন কতগুলো বস্তু অর্জন করার উপায় যার সাহায্যে মানুষের জীবন সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয় এবং সে আরাম ও সম্মানজনক জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। মানুষ নিজে যে আরাম ও সম্মান অর্জন করেছে, তার সন্তান-সন্ততিও তা ভোগ করুক, এ বাসনা মানুষের স্বভাবজাত।

এগুলোই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপকারিতা ও ফলাফল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা ভুল হবে না যে, যে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও ফলাফল লাভ করতে সক্ষম হয়, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে বেড়ে যায়; যদিও চর্মচক্ষে তা কম বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও ফলাফল কম অর্জন করে, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে হ্রাস পায়; যদিও চর্মচক্ষে তা অধিক মনে হয়ে থাকে।

একথা উপলব্ধি করে নেওয়ার পর এবার সুদের কারবারে দান-খয়রাতের ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আপনি প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারবেন যে, সুদখোরের ধন-সম্পদ যদিও ক্রমবর্ধিষ্ণু দেখা যায়, কিন্তু এ বর্ধিষ্ণুতা পাণ্ডুরোগীর দেহ ফুলে মোটা হয়ে যাওয়ারই মত। ফুলে যাওয়ার ফলে যে বর্ধিষ্ণুতা আসে তাও দেহেরই বৃদ্ধি, কিন্তু কোন সমঝদার মানুষই এ বর্ধিষ্ণুতাকে পছন্দ করতে পারে না। কেননা, সে জানে যে, এ বর্ধিষ্ণুতা মৃত্যুরই বার্তাবহ। এমনিভাবে সুদখোরের ধন-সম্পদ যতই ক্রমবর্ধমান দেখা যাক না কেন, সে এর উপকারিতা ও ফলাফল অর্থাৎ আরাম ও সম্মান থেকে সর্বদাই বঞ্চিত থাকে।

এখানে হয়ত কারও মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, আজকাল তো সুদখোরদেরই আধিপত্য বেশী। আরাম ও সম্মান তো দেখা যায় তাঁদেরই করায়ত্ত। দেখা যায়, তারাই প্রাসাদোপম বাড়ী-ঘরের মালিক। আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসের যাবতীয় সামগ্রীও তাদেরই হাতের মুঠোয়। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বসবাসের প্রয়োজনীয় বরং প্রয়োজনাতিরিক্ত আসবাবপত্রেরও তাদের অভাব নেই। নফর, চাকর এবং শান-শওকতের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম তাদেরই কাছে বিদ্যমান। কিন্তু চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে, আরামের সাজ-সরঞ্জাম তো কারখানায় নির্মিত এবং তা বাজারেও বিক্রয় হয়। স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে তা অর্জনও করা যায়। কিন্তু যার নাম আরাম ও শান্তি, তা কোন কারখানায় নির্মিত হয় না এবং বাজারেও বিক্রয় হয় না। তা এমন একটি রহমত, যা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই আসে। অনেক সময় বিস্তর সরঞ্জাম সত্ত্বেও তা অর্জিত হয় না। একটি নিদ্রা-সুখের কথাই ধরুন। এর জন্য মনোরম বাসগৃহ নির্মাণ করা যায়, সুষম আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা যায়, আসবাব-পত্র সুদৃশ্য ও মনোহারী করা যায় এবং ইচ্ছামত নরম বিছানা ও খাট যোগাড় করা যায়। কিন্তু এতসব সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় হলেই কি নিদ্রা অবশ্যম্ভাবী? আপনার হয়তো এ অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু হাজারো মানুষ এ প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলবে—যাদের কোন বিপত্তির কারণে নিদ্রা আসে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সম্পদশালী সভ্য দেশ সম্পর্কিত কোন কোন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সেখানে শতকরা পঁচাত্তর জন মানুষ ঘুমের বটিকা ব্যবহার না

করে ঘুমোতেই পারে না এবং মাঝে মাঝে বটিকাও তাদের ঘুম আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। ঘুমের সার-সরঞ্জাম আপনি বাজার থেকে কিনে আনতে পারেন। কিন্তু ঘুম কোন বাজার থেকে কোন মূল্যেই কিনে আনতে পারেন না। অন্যান্য আরাম এবং সুখের অবস্থাও তাই।

বিষয়টি বুঝে নেওয়ার পর সুদখোরদের অবস্থা পর্যালোচনা করুন। আপনি তাদের কাছে সবকিছু পাবেন কিন্তু আরাম ও সুখ পাবেন না। তার এক কোটিকে দেড় কোটি এবং দেড় কোটিকে দু'কোটি করার চিন্তায় তাদেরকে এমন বিভোর দেখা যাবে যে, খাওয়া-পরা এবং বিবি-বাচ্চাদের প্রতি লক্ষ্য করারও সময় নেই। কয়েকটি মিল-কারখানা চলছে. ভিনদেশ থেকে জাহাজ আসে—এসব নানাবিধ চিন্তার জাল বোনার মধ্যেই তাদের সকাল থেকে বিকাল এবং বিকাল থেকে সকাল হয়ে যায়। আফসোস, এ জ্ঞান-পাগলরা সুখের সাজ-সরঞ্জামকেই সুখ মনে করে নিয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তারা সুখ থেকে অনেক দূরে পড়ে রয়েছে।

এ হচ্ছে তাদের আরাম ও সুখের অবস্থা। এখন এদের সম্মানের অবস্থাটিও দেখে নিন। বলা বাহুল্য, সুদখোরেরা কঠোর প্রাণ ও নির্দয়। দরিদ্রদের দারিদ্র্য এবং স্বল্প পুঁজিওয়ালাদের পুঁজির স্বল্পতার সুযোগ গ্রহণ করাই তাদের পেশা। দরিদ্রদের রক্ত চুষে তারা তাদের নিজেদের উদর স্ফীত করে তোলে। তাই জনগণের অন্তরে তাদের প্রতি ইয্যত ও সম্ভ্রম থাকা অসম্ভব। নিজ দেশের মহাজন-ব্যবসায়ী এবং দুনিয়াজোড়া ছড়িয়ে থাকা ইহুদীদের ইতিহাস পাঠ করুন। তাদের সিন্দুক স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা যতই পরিপূর্ণ হোক না কেন, জগতের কোন কোণে এবং মানবগোষ্ঠীর কোন স্তরেই তাদের সম্মান নেই। বরং তাদের এ কর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের অন্তরে তাদের সম্পর্কে প্রতিহিংসা ও যুগপৎ ঘৃণারই সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বের সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ এ হিংসা ও ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ। শ্রম ও পুঁজির মধ্যকার সংগ্রামই বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে। কম্যুনিজমের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা এ হিংসা ও ঘৃণারই ফলশ্রুতি। ফলে সমগ্র বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। এ হচ্ছে তাদের সুখ ও সম্মানের অবস্থা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সুদের ধন-সম্পদ সুদখোরের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনকেও কখনও সুখময় করে না। হয় তারা ধ্বংস হয়ে যায়, না হয় এর অমঙ্গলে তারাও ধন-সম্পদের সত্যিকার ফলাফল ভোগে বঞ্চিত হয়।

ইউরোপীয় সুদখোরদের দৃষ্টান্ত থেকে সম্ভবত কেউ ধোঁকা খেতে পারে যে, তারা তো সবাই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী। তাদের বংশধররাও সমৃদ্ধিশালী হচ্ছে। কিন্তু প্রথমত, তাদের সমৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত চিত্র এইমাত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে! দ্বিতীয়ত তাদের অবস্থা হচ্ছে এরূপঃ মনে করুন, কোন আদমখোর অন্যান্য মানুষের রক্ত চুষে নিজ দেহের লালন-পালন করে এবং এ জাতীয় কতিপয় আদমখোর কোন এক মহল্লায় বসতি স্থাপন করেছে। আপনি কাউকে এ মহল্লায় নিয়ে গিয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করান। দেখা যাবে, তারা সবাই সুস্থ, সবল ও প্রফুল্ল। কিন্তু একজন মানবতার মঙ্গলকামী জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু এ মহল্লাই দেখবে না। সে এদের বিপরীতে ঐসব বস্তিও দেখবে, যাদের রক্ত চুষে

তাদেরকে অর্ধমৃত করে দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি আদমখোরদের মহল্লা এবং এসব বস্তির প্রতি লক্ষ্য করবে, সে কখনও মহল্লাবাসীদেরকে মোটাতাজা দেখে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে না এবং সামগ্রিক দিক দিয়ে এদের কর্মকে মানব জাতির উন্নতির উপায়ও বলতে পারবে না; বরং একে মানবতার বিপর্যয় ও ধ্বংস বলে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হবে।

এর বিপরীতে দান-খয়রাতকারীদেরকে দেখুন। তাদেরকে কখনও ধন-সম্পদের পিছনে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে দেখবেন না। সুখের সাজ-সরঞ্জাম যদিও তাদের কম, কিন্তু সাজ-সরঞ্জাম ওয়ালাদের চাইতে শান্তি, স্বস্তি এবং মানবিক স্থৈর্য তারা অনেকগুণ বেশী ভোগ করে থাকেন। বলা বাহুল্য, এটাই প্রকৃত সুখ। দুনিয়াতে প্রত্যেকেই তাদেরকে সম্মান ও ভক্তির চোখে দেখে থাকে।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ—মোট কথা, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। এ উক্তি পরকালের দিক দিয়ে তো সম্পূর্ণ পরিষ্কারই; সত্যোপলব্ধির সামান্য চেষ্টা করলে দুনিয়ার দিক দিয়েও সুস্পষ্ট। হুযুর (সা)-এর এ উক্তির উদ্দেশ্যও তাই ঃ

ان الربٰو وان كثر فان عاقبته تصير الى قل

অর্থাৎ সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ পরিণতি হচ্ছে স্বল্পতা—(মসনদে-আহমদ, ইবনে মাজাহ্)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ—অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাফির গোনাহ্গারকে পছন্দ করেন না।" এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা সুদকে হারামই মনে করে না, তারা কুফরে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও কার্যত সুদ খায়, তারা গোনাহ্গার, পাপাচারী।

তৃতীয় আয়াতে নামায ও যাকাতের নির্দেশের প্রতি অনুগত সৎকর্মশীল মু'মিনদের বিরাট পুরস্কার ও পরকালীন সুখ-শান্তি বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে সুদখোরদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি এবং লাঞ্ছনার কথা উল্লিখিত হয়েছিল। তাই কোরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এর সাথে সাথে ঈমানদার সৎকর্মী তথা নামায ও যাকাত আদায়কারীদের সওয়াব ও পরকালীন মর্তবা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

চতুর্থ অর্থাৎ এই আয়াতের সারমর্ম হলো, সুদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পর সুদের যেসব বকেয়া অর্থ কারও কাছে প্রাপ্য ছিল, এ আয়াতে সেগুলোর লেনদেনও হারাম করা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, সুদের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবে ব্যাপকভাবে সুদী কারবারের প্রচলন ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এর নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হলে মুসলমানরা যথারীতি সুদের কাজ-কারবার পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কিছু-সংখ্যক লোকের বকেয়া সুদের দাবী তখনো অন্যদের উপর অবশিষ্ট ছিল। বনী সাকীফ ও বনী মখযুমের মধ্যে পরস্পর সুদের কারবার বহাল ছিল এবং বনী সাকীফের কিছু সুদের দাবী তখনও পর্যন্ত বনী মখযুমের উপর অবশিষ্ট ছিল। বনী মখযুম মুসলমান হওয়ার পর সুদের টাকা পরিশোধ করাকে অবৈধ মনে করতে থাকে। আবার এদিকে বনী সাকীফ তাদের প্রাপ্ত সুদ দাবী করতে থাকে। কারণ, তারা মুসলমান ছিল না, কিন্তু মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। বনী মখযুমের বক্তব্য ছিল এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমরা যে হালাল উপার্জন করছি, তা সুদ পরিশোধে ব্যয় করবো না।

এ মতবিরোধের ঘটনাস্থল ছিল মক্কা মুকাররমা। তখন মক্কা বিজিত হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে মক্কার শাসক ছিলেন হযরত মু'আয (রা)। অন্য রেওয়ায়েত মতে ইতাব ইবনে উসায়দ (রা)। তিনি নির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে ঘটনার বিবরণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট লিপিবদ্ধ করে পাঠালেন। এরই প্রেক্ষিতে কোরআন পাকের আলোচ্য এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এর সারমর্ম এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর সুদের পূর্ববর্তী সব কাজ-কারবার অবিলম্বে মওকুফ করে দিতে হবে। অতীত সুদও গ্রহণ না করে শুধু মূলধন আদায় করতে হবে।

এই ইসলামী আইন কার্যকর হলে মুসলমানরা তো তা মানতে বাধ্য ছিলই, যেসব অমুসলিম গোত্র মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ইসলামী আইন কবুল করে নিয়েছিল, তারাও এই আইন মেনে নিতে বাধ্য হল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বিদায়-হজ্জের ভাষণে এ আইন ঘোষণা করলেন, তখন একথাও প্রকাশ করলেন যে, এ আইন ব্যক্তি বিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ কিংবা মুসলমানদের আর্থিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে নয় ; বরং সমগ্র মানব সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই জারি করা হয়েছে। তাই আমি সর্বপ্রথম অ-মুসলমানদের কাছে মুসলমানদের প্রাপ্য বকেয়া সুদের বিরাট অংক মওকুফ করে দিচ্ছি। এখন তাদেরও নিজ নিজ বকেয়া সুদের অংক ছেড়ে দিতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। তিনি এ ভাষণে বলেন ঃ

الا ان كل ربٰو كان فى الجاهلية موضوع عنكم كله - لكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون واول ربٰو موضوع ربا العباس بن عبد المطلب كله -

অর্থাৎ জাহিলিয়ত যুগে সুদের যেসব লেনদেন হয়েছে, সবগুলোর সুদ ছেড়ে দেওয়া হলো। এখন প্রত্যেকেই মূলধন পাবে। সুদের অতিরিক্ত অংক পাবে না। তোমরা সুদ আদায় করে আর কারও উপর জুলুম করতে পারবে না এবং কেউ মূলধন পরিশোধ করতে অস্বীকার করে তোমাদের উপর জুলুম করতে পারবে না। সর্বপ্রথম যে সুদ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের প্রাপ্য সুদ। এ সুদের বিরাট অংক অমুসলিমদের কাছে প্রাপ্য ছিল। কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত এবং বকেয়া সুদ ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে اتَّقُوا اللهَ (আল্লাহ্‌কে ভয় কর) আদেশ দ্বারা আয়াতটি শুরু করা হয়েছে। এরপর আসল বিষয়ের নির্দেশ বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমেই কোরআন পাক সমগ্র বিশ্বের অন্য সকল বিধানসমূহের তুলনায় এক অনন্য স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। মানুষের পক্ষে পালন করা কঠিন মনে হয়—যখনই এরূপ কোন আইন কোরআন পাকে বর্ণনা করা হয়েছে, তখনই আগে পরে আল্লাহ্‌র সামনে হাযিরা, হিসাব-নিকাশ এবং পরকালের শাস্তি অথবা সওয়াবের কথা উল্লেখ করে মুসলমানদের অন্তর ও মন-মানসকে তা পালন করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এরপরে নির্দেশ শুনানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও অতীত সুদের অঙ্ক ছেড়ে দেওয়া মানবমনের পক্ষে কঠিন হতে পারত। তাই আগে اتقوا الله বলে এরপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ঃ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا অর্থাৎ বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ—অর্থাৎ যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করা এবং বিরুদ্ধাচরণ না করাই ঈমানের পরিচায়ক। নির্দেশটি পালন কষ্টসাধ্য ছিল বলেই নির্দেশের পূর্বে اتقوا الله এবং নির্দেশের পরে ان كنتم مؤمنين যুক্ত করা হয়েছে।

এরপর পঞ্চম আয়াতে এ নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে কঠোর শাস্তির কথা শুনানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি সুদ না ছাড়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা শুনে নাও। কুফর ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তম গোনাহের কারণে কোরআন পাকে এতবড় শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

অর্থাৎ যদি তোমরা তওবা করে ভবিষ্যতের জন্য বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে

কৃতসংকল্প হও, তবে তোমরা আসল মূলধন ফেরত পেয়ে যাবে। মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারও উপর জুলুম করতে পার না এবং কেউ মূলধন হ্রাস করে কিংবা পরিশোধে বিলম্ব করে তোমাদের উপরও জুলুম করতে পারবে না। আয়াতে আসল মূলধন দেওয়াকে তওবার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমরা তওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প হও, তবেই তোমরা আসল মূলধন পাবে।

এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, সুদ ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করে তওবা না করলে মূলধনও পাবে না। এ মাস'আলার বিবরণ এই যে, যদি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সুদকে হারামই মনে না করে, পরন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক সুদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য তওবা না করে, তবে এ ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ, ধর্মত্যাগী। ধর্ম-ত্যাগীর ধন-সম্পদ তার মালিকানায় থাকে না। মুসলমান অবস্থায় সে যা উপার্জন করে, তা মুসলমান উত্তরাধিকারীরা পেয়ে যায় এবং ধর্ম ত্যাগ করার পর কাফির অবস্থায় যা উপার্জন করে, তা সরকারী ধনাগারে জমা হয়। তাই সুদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য তওবা না করা যদি হালাল মনে করার কারণে হয়, তবে আসল মূলধনও সে ফেরত পাবে না। পক্ষান্তরে যদি হারাম মনে করেও কার্যত সুদ থেকে বিরত না হয় এবং দল গঠন করে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, তবে সে বিদ্রোহী। বিদ্রোহীরও সকল সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সরকারী ধনাগারে জমা করা হয়। যখন সে তওবা করে তখন আবার সহায়-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হয়। বস্তুত এ জাতীয় সূক্ষ্ম দিকগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই শর্তের আকারে বলা হয়েছে ঃ فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ —

অর্থাৎ যদি তওবা না কর, তবে তোমাদের মূলধনও বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

এরপর ষষ্ঠ আয়াতে সুদখোরীর মানবতা বিরোধী কাণ্ডকীর্তির বিপরীতে পূত-পবিত্র চরিত্র এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি কৃপামূলক ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ -

—অর্থাৎ তোমার খাতক যদি রিক্তহস্ত হয়—ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হয়, তবে শরীয়তের নির্দেশ এই যে, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া পর্যন্ত সময় দেওয়া বিধেয়। যদি তাকে ঋণ থেকেই রেহাই দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য আরও উত্তম।

সুদখোরদের অভ্যাস এই যে, খাতক নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হলে সুদের অংক আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালায় এবং সুদের হারও আগের চাইতে বাড়িয়ে দেয়।

এখানে শ্রেষ্ঠতম বিচারপতি আল্লাহ্ তা'আলা আইন প্রণয়ন করে দিয়েছেন যে, কোন খাতক বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ঠ করা জায়েয নয়; বরং তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন যে, যদি এ গরীবকে ক্ষমা করে দাও তবে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম।

এখানে ক্ষমা করাকে কোরআন পাক সদ্‌কা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের জন্য সদ্‌কা হয়ে যাবে এবং বিরাট সওয়াবের কারণ হবে। এছাড়া আরও বলেছেন ঃ ক্ষমা করা তোমাদের জন্য উত্তম। অথচ বাহ্যত এতে তাদের ক্ষতি। কারণ, সুদ তো ছেড়েই দেওয়া হয়েছিল, এখন মূলধনও গেল। কিন্তু কোরআন পাক একে উত্তম বলেছেন এর কারণ দ্বিবিধ ঃ এক, এটা যে উত্তম, তা এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের পর চোখের সামনে এসে যাবে। তখন এ সামান্য অর্থের বিনিময়ে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত অর্জিত হবে। দুই, এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, দুনিয়াতেও এ কার্যের কল্যাণকারিতা প্রত্যক্ষ করা যাবে। অর্থাৎ তোমাদের ধন-সম্পদে বরকত হবে। বরকতের স্বরূপ এই যে, অল্প ধন-সম্পদ দ্বারা অধিক কাজ সাধিত হবে। এর জন্য ধন-সম্পদের পরিমাণ ও সংখ্যা বেড়ে যাওয়া জরুরী নয়। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এই যে, খয়রাতকারীদের ধন-সম্পদে অপরিসীম বরকত হয়। তাদের অল্প ধন-সম্পদ দ্বারা এত অধিকতর কাজ সাধিত হয় যে, হারাম মালের অধিকারীদের বিপুল পরিমাণ অর্থকড়ি দ্বারা তত কাজ সাধিত হয় না।

বরকতহীন ধন-সম্পদের অবস্থা এই যে, যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়, তা অর্জিত হয় না কিংবা উদ্দেশ্য নয়—এমন কাজেই তা অধিক ব্যয়িত হয়ে যায়। যেমন, ঔষধ-পত্র, চিকিৎসা এবং ডাক্তারের দর্শনী ইত্যাদি। এসব কাজে ধনীদের বিস্তর অর্থ ব্যয় হয়ে যায়। গরীবদের এগুলোর দরকার খুব কমই হয়ে থাকে। প্রথমত, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সুস্থতার নিয়ামত দান করেন। ফলে চিকিৎসায় অর্থ ব্যয় করার বড় একটা প্রয়োজনই তাদের জন্য দেখা দেয় না। দ্বিতীয়ত, অসুস্থ হলেও মামুলী খরচেই তাদের জন্য সুস্থতা অর্জিত হয়ে যায়। এ হিসাবে নিঃস্ব খাতককে কর্জ মাফ করে দেওয়া বাহ্যত অলাভজনক দেখা গেলেও কোরআনের এ শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এ একটি উপকারী ও লাভজনক কাজ।

নিঃস্ব খাতকের সাথে নম্রতার শিক্ষাসম্বলিত সহীহ্ হাদীসসমূহের কতিপয় বাক্য শুনুন ঃ তিবরানীর এক হাদীসে আছে—যেদিন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া মাথা গুঁজবার কোন ছায়া পাবে না, সেদিন যে ব্যক্তি স্বীয় মস্তকের উপর আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়া কামনা করে, তার উচিত নিঃস্ব খাতকের সাথে নম্র ব্যবহার করা কিংবা তাকে মাফ করে দেওয়া।

সহীহ্ মুসলিমেও এ বিষয়ের হাদীস রয়েছে। মসনদে আহ্‌মদের এক হাদীসে আছে—যে ব্যক্তি কোন নিঃস্ব দেনাদারকে সময় দেবে, সে প্রত্যহ দেনা পরিমাণ অর্থ সদ্‌কা করার সওয়াব পাবে। দেনার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সময় দেওয়ার জন্য হবে এ হিসাব। যখন দেনার মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায় এবং দেনাদার দেনা পরিশোধ করতে সক্ষম না হয়, তখন সময় দিলে প্রত্যহ দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ সদকা করার সওয়াব পাবে।

এক হাদীসে আছে—যে ব্যক্তি চায় যে, তার দোয়া কবুল হোক কিংবা বিপদ দূর হোক, তার উচিত নিঃস্ব দেনাদারকে সময় দেওয়া।

এরপর শেষ আয়াতে পুনরায় কেয়ামতের ভয়, হাশরের হিসাব-নিকাশ এবং সওয়াব ও আযাব উল্লেখ করে সুদ সংক্রান্ত এ আয়াত সমাপ্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

অর্থাৎ ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে হাযিরার জন্য আনীত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান পাবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ অবতরণের দিক দিয়ে এটি সর্বশেষ আয়াত। এরপর কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এর একত্রিশ দিন পর হুযুর (সা) ওফাত পান। কোন কোন রেওয়ায়েতে নয় দিন পর হযরত রসূলে করীম (স)-এর ওফাতের কথা বর্ণিত আছে।

এ পর্যন্ত সুদের বিধি-বিধান সম্পর্কিত সূরা বাক্কারার আয়াতসমূহের তফসীর বর্ণিত হলো। সুদের অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কোরআন পাকে সূরা বাক্কারায় সাত আয়াত, সূরা আলে-ইমরানে এক আয়াত এবং সূরা নিসায় দুটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে। সূরা রূমেও একটি আয়াত আছে, যার তফসীরে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ একেও সুদের অর্থে ধরেছেন এবং কেউ কেউ অন্যবিধ ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। এভাবে কোরআন পাকের দশটি আয়াতে সুদের বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে।

সুদের পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করার পূর্বে সূরা আলে-ইমরান, সূরা নিসা এবং সূরা রূমে উল্লিখিত অবশিষ্ট আয়াতসমূহের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যাও এ স্থলে করে দেওয়া সমীচীন মনে হয়। তাতে সবগুলো আয়াতই একত্র হওয়ার ফলে সুদের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে।

সূরা আলে-ইমরানের ১৩শ রুকূর ১৩০তম আয়াতটি এইঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা সুদ খেয়ো না দ্বিগুণ, চতুর্গুণ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সফল হবে।"

এ আয়াত অবতরণের একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে। জাহিলিয়ত আমলের আরবে সুদ গ্রহণের সাধারণ রীতি ছিল এই যে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সুদের উপর বাকী দেওয়া হতো। মেয়াদ এসে গেলে দেনাদার যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে তাকে আরও সময় দেওয়া হতো। এমনিভাবে দ্বিতীয় মেয়াদেও যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে

দেওয়া হতো। সাধারণ তফসীর গ্রন্থসমূহে এবং বিশেষভাবে 'লুবাবুন্নুকুল' গ্রন্থে মুজাহিদের রেওয়ায়েতক্রমে এ বিবরণ উল্লিখিত আছে।

জাহিলিয়ত যুগের সে সর্বনাশা প্রথা বিলোপ করার জন্যই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ কারণেই আয়াতে أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً — (অর্থাৎ, কয়েকগুণ অতিরিক্ত) বলে তাদের প্রচলিত পদ্ধতির নিন্দা এবং অপরের চরম সর্বনাশ সাধন করে স্বার্থ উদ্ধার করার ঘৃণ্য মানসিকতা সম্পর্কে হুশিয়ার করে একে হারাম করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, কয়েকগুণ অতিরিক্ত না হলে সুদ হারাম হবে না। কেননা, সূরা বাক্বারা ও নিসায় যে কোন ধরনের সুদের অবৈধতা পরিষ্কার বর্ণিত হয়েছে ; কয়েকগুণ বেশী হোক বা না হোক। এর দৃষ্টান্ত যেমন কোরআনের স্থানে স্থানে বলা হয়েছেঃ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا —অর্থাৎ আমার আয়াতের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করো না। এতে 'অল্প মূল্য' বলার কারণ এই যে, খোদায়ী আয়াতের বিনিময়ে যদি সপ্তরাজ্যও গ্রহণ করা হয়, তবে অল্প মূল্যই হবে। এর অর্থ এই নয় যে, কোরআনের আয়াতের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করা তো হারাম, বেশী মূল্য হারাম নয়। এমনিভাবে এ আয়াতে أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً শব্দটি তাদের লজ্জাকর পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এটি অবৈধতার শর্ত নয়।

• সুদের প্রচলিত পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে একথাও বলা যায় যে, সুদের অভ্যাস গড়ে উঠলে সুদ শুধু সুদই থাকে না, বরং অপরিহার্যভাবে দ্বিগুণ চতুর্গুণ হয়ে ক্রমবর্ধিত অস্তিত্ব পেয়ে যায়। কারণ, সুদের যে অংক সুদখোরের মালের অন্তর্ভুক্ত হয়, সে অতিরিক্ত অংকটিও পুনর্বার সুদেই খাটানো হয়। ফলে সুদ কয়েকগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এ নিয়ম অব্যাহত থাকলে সুদের অংক أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً অর্থাৎ কয়েকগুণেরও কয়েকগুণ হয়ে যায়। এমনিভাবে প্রত্যেক সুদ পরিমাণে দ্বিগুণ চতুর্গুণই হয়।

সুদ সম্পর্কে সূরা নিসার দু'টি আয়াত এই ঃ

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۝ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

অর্থাৎ "ইহুদীদের এসব বড় বড় অপরাধের কারণে আমি অনেক পবিত্র বস্তু—যা তাদের জন্য হালাল ছিল—তাদের উপর হারাম করে দিয়েছি এবং তা এ কারণে যে, তারা অনেক মানুষের সুপথ প্রাপ্তির পথে অন্তরায় হয়ে যেতো এবং তা এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করতো। অথচ তাদেরকে সুদ গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতো। আমি তাদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি।"

এ দু' আয়াত থেকে জানা গেল যে, মূসা (আ)-র শরীয়তেও সুদ হারাম ছিল। ইহুদীরা যখন এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন দুনিয়াতেও তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয় অর্থাৎ তারা জাগতিক লালসার বশবর্তী হয়ে হারাম খেতে শুরু করলে আল্লাহ্ তা'আলা কতক পবিত্র বস্তুও তাদের জন্য হারাম করে দেন।

সূরা রূমের ৪র্থ রুকূর ৩৯তম আয়াতে আছেঃ

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝

অর্থাৎ "যে বস্তু তোমরা মানুষের ধন-সম্পদে পৌঁছে বেড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দাও, তা আল্লাহ্র কাছে বাড়ে না এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় যাকাত দিলে যাকাত প্রদানকারী আল্লাহ্র কাছে তা বাড়িয়ে নেয়।"

কোন কোন তফসীরকার 'রিবা' শব্দ এবং বেড়ে যাওয়ার অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ আয়াতকে সুদের অর্থে ধরে নিয়েছেন। তাঁরা এর ব্যাখা প্রসঙ্গে বলেনঃ সুদ গ্রহণে যদিও বাহ্যত ধন-সম্পদের বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা বৃদ্ধি নয়। উদাহরণত কারও দেহ ফুলে গেলে বাহ্যত তা দেহের বৃদ্ধি বলে মনে হলেও কোন বুদ্ধিমানই একে পুষ্টি ও বৃদ্ধি মনে করে আনন্দিত হয় না। বরং একে ধ্বংসের পূর্বাভাসই মনে করে। এর বিপরীতে যাকাত ও সদকা দেওয়ার মধ্যে যদিও বাহ্যত ধন-সম্পদ হ্রাস পায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হ্রাস নয়, বরং ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধির কারণ। উদাহরণত কেউ কেউ পেটের দূষিত বস্তু বের করার জন্য জোলাপ ব্যবহার করে কিংবা শিঙ্গা লাগিয়ে দূষিত রক্ত বের করে নেয়। তার ফলে বাহ্যত সে ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেহে ভারশক্তির অভাব অনুভূত হয়। কিন্তু অভিজ্ঞজনের দৃষ্টিতে এ অভাব তার বল ও শক্তিরই অগ্রদূত।

কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতকে সুদ-নিষেধাজ্ঞার অর্থে ধরেন নি। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় ধন-সম্পদ অপরকে আন্তরিকতা ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নয়, বরং প্রতিদানে আরও বেশী পাওয়ার নিয়তে দেয়, তা বাহ্যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও আল্লাহ্র কাছে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। উদাহরণত অনেক সমাজে বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিতদের পক্ষ থেকে বর-কনেকে টাকা-পয়সা ও আসবাবপত্র দেওয়ার

প্রথা প্রচলিত আছে। এগুলো উপঢৌকন হিসাবে নয়, বরং প্রতিদান গ্রহণের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়। এ দান যেহেতু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং নিজ স্বার্থে হয়ে থাকে, তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এভাবে ধন-সম্পদ বাহ্যত ক্রমবর্ধমান হতে থাকলেও আল্লাহ্‌র কাছে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। হাঁ, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য যে সব যাকাত ও সদকা দেওয়া হয়, তাতে বাহ্যত ধন-সম্পদ হ্রাস পেলেও আল্লাহ্‌র কাছে তা দ্বিগুণ-চতুর্গুণ হয়ে যায়।

এ তফসীর অনুযায়ী উল্লিখিত আয়াতের বিষয়বস্তু — وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ — আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ হয়ে যায়। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ আপনি প্রতিদানে অধিক ধন-সম্পদ অর্জন করার নিয়তে কারও প্রতি অনুগ্রহ করবেন না।

সূরা রূমের আলোচ্য আয়াতে বাহ্যত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য মনে হয়। প্রথম কারণ এই যে, সূরা রূম মক্কায় অবতীর্ণ। অবশ্য, এতে যদিও প্রত্যেকটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া জরুরী নয়; কিন্তু অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রবল ধারণা অবশ্যই জন্মে। আয়াতটি যদি মক্কায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে একে সুদ-নিষেধাজ্ঞার অর্থে ধরে নেওয়া যায় না। কেননা, সুদের নিষেধাজ্ঞা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ আয়াতের পূর্বে উল্লিখিত বিষয়বস্তু দ্বারাও দ্বিতীয় ব্যাখ্যার অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۔ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۔

—অর্থাৎ "আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে, এটা তাদের জন্য উত্তম।"

এ আয়াতে শর্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিয়তে ব্যয় করা হলেই আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করা সওয়াবের কাজ হবে। অতএব, এর পরবর্তী আয়াতে এ শর্তের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, প্রতিদানে বেশী পাওয়ার নিয়তে যদি কাউকে ধন-সম্পদ দেওয়া হয়, তবে তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দেওয়া হলো না। কাজেই এর সওয়াব পাওয়া যাবে না।

মোট কথা, সুদের অবৈধতার প্রশ্নে এ আয়াতটিকে বাদ দিলেও পূর্বোল্লিখিত আরও অনেক আয়াত বর্তমান রয়েছে। তন্মধ্যে সূরা আলে-ইমরানের এক আয়াতে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ সুদের অবৈধতা বর্ণিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট সব আয়াতে সর্বাবস্থায় সুদের অবৈধতা ব্যক্ত হয়েছে। এ বিবরণ থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সুদ দ্বিগুণ-চতুর্গুণ

হোক বা চক্রবৃদ্ধি হোক কিংবা একতরফা হোক সবই হারাম এবং হারামও এমন কঠোর যে, এর বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শোনান হয়েছে।

রিবা'র আরও কিছু ব্যাখ্যা

আজকাল সুদ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে কোরআন ও সুন্নাতে যখন এর অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা দৃষ্টিগোচর হয় এবং এর স্বরূপ বোঝা ও বোঝান হয়, তখন সাধারণ মন-মানস এর অবৈধতা মেনে নিতে ইতস্তত করে এবং নানা রকম বাহানা সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই আলোচনাটিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে এর প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই এখানে এ সম্পর্কিত একটা ধারাবাহিক আলোচনার সূত্রপাত করা হচ্ছে।

প্রথম ঃ কোরআন ও সুন্নাহ্তে 'রিবা'র স্বরূপ কি এবং এর প্রকার কি কি?

দ্বিতীয় ঃ রিবার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞার রহস্য ও উপযোগিতা কি?

তৃতীয় ঃ সুদ বা 'রিবা' যতই মন্দ হোক না কেন, এটি বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি ও বাণিজ্য নীতির প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। যদি কোরআনী নির্দেশ অনুযায়ী একে পরিত্যাগ করা হয়, তবে ব্যাংক ও বাণিজ্যনীতি কিভাবে চালু থাকবে?

'রিবা' শব্দের ব্যাখ্যা ঃ একটি বিভ্রান্তিকর ঘটনা ও উত্তর ঃ 'রিবা' আরবী ভাষার একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি এবং কোরআন অবতরণের পূর্বে জাহিলিয়ত যুগের আরবেও এ শব্দটি প্রচলিত ছিল। শুধু প্রচলিতই নয়, বরং রিবার লেনদেনও তখনকার সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। সুতরাং সূরা নিসার আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, 'রিবা' শব্দ এবং এর লেনদেন তওরাতের আমলেও সুবিদিত ছিল এবং তওরাতেও একে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

যে শব্দ প্রাচীনকাল থেকেই আরবে ও নিকটবর্তী দেশসমূহে সুবিদিত রয়েছে, যার লেনদেনেরও প্রচলন রয়েছে এবং যার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করার সাথে কোরআন পাক বলে যে, মূসা (আ)-র উম্মতের জন্যও সুদ বা 'রিবা' হারাম করা হয়েছিল, তখন এটা জানা কথা যে, সেই শব্দের স্বরূপ এমন ধরনের কোন অস্পষ্ট বিষয় হতে পারে না যে, তাকে বুঝতে গিয়ে অহেতুক জটিলতা দেখা দেবে।

এ কারণেই অষ্টম হিজরীতে যখন সুদ বা 'রিবা'র অবৈধতা সম্পর্কে সূরা বাক্বারার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়, তখন কোথাও বর্ণিত হয়নি যে, সাহাবায়ে-কিরাম 'রিবা' শব্দের স্বরূপ বোঝার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দিগ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং মহানবী (সা)-র কাছ থেকে অন্যান্য ব্যাপারের মত রিবার স্বরূপ সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। বরং দেখা গেছে যে, মদ্যপানের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে যেমন সাহাবায়ে-কিরাম তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়েছিলেন, তেমনি রিবার অবৈধতার বিধান নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই তাঁরা রিবার যাবতীয় লেনদেনও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অতীতকালের

কাজ-কারবারে মুসলমানদের যেসব সুদ অ-মুসলমানদের কাছে প্রাপ্য ছিল, মুসলমানরা তাও ছেড়ে দেন। অ-মুসলমানদের যেসব মুসলমানদের কাছে সুদ প্রাপ্য ছিল, নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানরা তা পরিশোধে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এ মাস'আলা মক্কার প্রশাসকের আদালতে উপস্থিত হলে তিনি মহানবী (সা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। এর ফয়সালা সূরা বাক্কারার সংশ্লিষ্ট আয়াতে আল্লাহ্র তরফ থেকেই অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ অতীতকালের বকেয়া সুদের লেন-দেনও অবৈধ বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়।

এতে অ-মুসলমানদের পক্ষ থেকে এরূপ অভিযোগ উত্থাপনের অবকাশ ছিল যে, ইসলামী শরীয়তের একটি নির্দেশের কারণে তাদের এত বিপুল পরিমাণ অর্থ কেন মারা যাবে? এ অভিযোগ নিরসনের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, এ নির্দেশের আওতাধীন শুধু অ-মুসলমানরাই নয়---মুসলমানরাও। উভয়ের ক্ষেত্রেই এ নির্দেশ সমভাবে প্রযোজ্য। সেমতে সর্বপ্রথম মহানবী (সা)-র চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর বিরাট অংকের সুদ ছেড়ে দেওয়া হয়।

মোট কথা, রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার সময় 'রিবা' শব্দের ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা ছিল না---সকলের কাছেই তার প্রকৃত অর্থ সুবিদিত ছিল। আরবরা যাকে রিবা বলতো এবং যার লেন-দেন করতো, কোরআন তাকেই হারাম করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) এ বিধানকে শুধু নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয়---দেশের আইন হিসাবেও জারি করেন। তবে এমন কতকগুলো প্রকারকেও তিনি রিবার অন্তর্ভুক্ত করে দেন, যেগুলোকে সাধারণভাবে রিবা মনে করা হতো না। এসব প্রকার নির্ধারণের ব্যাপারেই হযরত ফারুকে-আযম (রা)-এর মনে খটকা দেখা দিয়েছিল এবং এগুলোর ব্যাপারেই মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেছেন। নতুবা আরবরা যাকে রিবা বলতো, সেই আসল রিবা সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহ ছিল না এবং কেউ এ নিয়ে কোন মতভেদও ব্যক্ত করেন নি।

এবার আরবে প্রচলিত 'রিবা' সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। তফসীরবিদ ইবনে জারীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন ঃ জাহিলিয়ত আমলে প্রচলিত ও কোরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা' হল কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা। আরবরা তাই করতো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সুদ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হতো। হযরত কাতাদাহ্ এবং অন্যান্য তফসীরবিদ থেকেও এ কথাই বর্ণিত হয়েছে।---(তফসীরে ইবনে-জারীর, ৩য় খণ্ড, ৬২ পৃঃ)

স্পেনের খ্যাতনামা তফসীরবিদ আবু হাইয়ান গারনাতী রচিত 'তফসীরে-বাহ্রে মুহীত-এ'ও জাহিলিয়ত আমলে প্রচলিত রিবার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি এরূপই বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ তারা অর্থ লগ্নি করে মুনাফা গ্রহণ করতো এবং ঋণের মেয়াদ যতই বেড়ে যেতো, ততই সুদ বাড়িয়ে দেওয়া হতো। এরাই বলতো যে, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মুনাফা নেওয়া যেমন জায়েয, তেমনি অর্থ ঋণ দিয়ে মুনাফা নেওয়াও তদ্রূপ জায়েয হওয়া উচিত। কোর-আন পাক একে হারাম করেছে এবং ক্রয়-বিক্রয় ও রিবার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছে।

এ বিষয়বস্তুই তফসীরে ইবনে কাসীর, তফসীরে কবীর ও রূহুল-মা'আনী প্রভৃতি বিশিষ্ট তফসীর গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের মাধ্যমে বর্ণিত রয়েছে।

ইবনে-আরাবী আহকামুল-কোরআনে বলেছেন :

الرّبا فى اللغة الزّيادة والمراد به فى الاية كل زيادة لايقا بلها عوض -(ص ١٠١ ج ٢)-

---অর্থাৎ অভিধানে 'রিবা' শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। আয়াতে রিবা বলতে প্রত্যেক এমন অতিরিক্ত পরিমাণকে বোঝান হয়েছে যার বিপরীতে কোন বিনিময় নেই।—(আহ্-কামুল-কোরআন : ২য় খণ্ড, ১০১ পৃঃ)

ইমাম রাযী স্বীয় তফসীরে বলেন : 'রিবা' দু' রকম—ক্রয়-বিক্রয়ের রিবা ও ঋণের রিবা। জাহিলিয়ত যুগের আরবে দ্বিতীয় প্রকার রিবাই প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল। তারা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কাউকে অর্থ প্রদান করতো এবং প্রতি মাসে তার মুনাফা আদায় করতো। নির্দিষ্ট মেয়াদে আদায় না হলে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে মেয়াদও বাড়িয়ে দিতো। জাহিলিয়ত যুগের সেই রিবাই কোরআন হারাম করেছে।

ইমাম জাস্‌সাস 'আহ্‌কামুল-কোরআন'-এ রিবার অর্থ বর্ণনা করে বলেন :

هو القرض المشروط فيه الاجل وزيادة مال على المستقرض -

অর্থাৎ এ এমন ঋণ, যা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এ শর্তে দেওয়া হয় যে, খাতক তাকে মূলধন থেকে কিছু বেশী পরিমাণ অর্থ দেবে।

হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) রিবার সংজ্ঞা বর্ণনা করে বলেন :

كل قرض جر نفعا فهو ربا — অর্থাৎ যে ঋণ কোন মুনাফা টানে, তা-ই রিবা। ---(জামে' সগীর)

মোট কথা, কাউকে ঋণ দিয়ে তার মাধ্যমে মুনাফা গ্রহণ করাই সুদ বা রিবা। জাহিলিয়ত আমলে তা-ই প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল। কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াত একে সুস্পষ্টভাবে হারাম করেছে। এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে-কিরাম এ কারবার পরিত্যাগ করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) আইনগত বিধি-বিধানে একে প্রয়োগ করেন। এতে কোনরূপ অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থতা ছিল না এবং এ ব্যাপারে কেউ সন্দিগ্ধতারও সম্মুখীন হন নি।

তবে নবী করীম (সা) কয়েক রকম ক্রয়-বিক্রয়কেও রিবার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আরবরা এগুলোকে রিবা মনে করতো না। উদাহরণত তিনি ছয়টি বস্তু সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এগুলো অদল-বদল করতে হলে সমান সমান এবং হাতে হওয়া দরকার। কম-বেশী কিংবা বাকী হলে তাও রিবা হবে। এ ছয়টি বস্তু হচ্ছে সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর ও আঙুর।

আরবে কাজ-কারবারের কয়েকটি প্রকার 'মুযাবানা' ও 'মুহাকালা'[১] নামে প্রচলিত ছিল। সুদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) এগুলোকেও সুদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন।---(ইবনে-কাসীর)

এতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, বিশেষ করে উপরোক্ত ছয়টি বস্তুর মধ্যেই সুদ সীমাবদ্ধ, না এগুলো ছাড়া আরও কিছু বস্তু এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে? হযরত ফারুকে-আযম (রা) এ সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েই নিম্নোক্ত উক্তি করেছিলেন:

انّ ایۃ الربٰو من اخر ما نزل من القران و ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبض قبل ان یبینہ لنا فدعوا الربٰو والریبۃ ○ (احکام القرآن جصاص ، ص ۵۵۱ . وتفسیر ابن کثیر بحوالہ ابن ماجہ ص ۳۲۸ ج ۱)-

অর্থাৎ সুদের আয়াত হচ্ছে কোরআন পাকের সর্বশেষ আয়াতসমূহের অন্যতম। এর পূর্ণ বিবরণ দান করার পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাই এখন সতর্ক পদক্ষেপ জরুরী। সুদ তো অবশ্যই বর্জন করতে হবে, তদুপরি যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহও হয়, সেগুলোও পরিহার করা উচিত।---(আহ্‌কামুল-কোরআন, জাস্‌সাস, ইবনে-কাসীর)

ফারুকে-আযম (রা)-এর উদ্দেশ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ঐসব প্রকারকেও রিবার অন্তর্ভুক্তি-করণ ছিল, যেগুলোকে জাহিলিয়ত যুগের আরবে সুদ মনে করা হতো না। রসূলুল্লাহ্ (সা) এগুলোকে সুদের অন্তর্ভুক্ত করে হারাম করেছিলেন। আসল 'রিবা' বা সুদ যা সমগ্র আরবে সুবিদিত ছিল, সাহাবায়ে কিরাম যা ত্যাগ করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) যে সম্পর্কে আইন জারি করে বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন, সে সুদ সম্পর্কে ফারুকে-আযমের মনে কোনরূপ খট্‌কা বা সন্দেহ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এরূপ চিন্তাও করা যায় না। কিন্তু সুদের যেসব প্রকার সম্পর্কে তিনি সন্দিগ্ধ ছিলেন, সেগুলোর ব্যাপারে তিনি সমাধান প্রদান করেন যে, যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহ হয়, সেগুলোকেও পরিত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজকাল কিছু সংখ্যক লোক, যারা পাশ্চাত্যের বাহ্যিক জাঁকজমক, ধনাঢ্যতা এবং বর্তমান বাণিজ্যনীতি ইত্যাদিতে সুদের প্রাধান্য বিস্তারের মোহে মোহগ্রস্ত, তারা ফারুকে-আযমের উপরোক্ত উক্তির ব্যাখ্যা এই বের করেছে যে, রিবার অর্থই অস্পষ্ট ও অব্যক্ত ছিল। কাজেই এতে গবেষণার অবকাশ রয়েছে। তাদের এ

---

১. বৃক্ষস্থিত ফলকে বৃক্ষ থেকে আহরিত ফলের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে 'মুযাবানা' বলা হয় এবং ক্ষেতে অকর্তিত খাদ্যশস্য; যথা—গম, বুট ইত্যাদিকে শুকনা পরিষ্কার করা খাদ্য যথা: গম, বুট ইত্যাদির বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে 'মুহাকালা' বলা হয়। যেহেতু অনুমানে কম-বেশী হওয়ার আশংকা থাকে তাই এগুলো নিষিদ্ধ হয়েছে।

অভিমত যে ভ্রান্ত, তার যথেষ্ট প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। 'আহ্কামুল-কোরআন'-এ ইবনে আরাবী এ শ্রেণীর লোকের কঠোর সমালোচনা করেছেন, যারা ফারুকে আযমের উপরোক্ত উক্তির ভিত্তিতে সুদের আয়াতকে অস্পষ্ট বলে অভিহিত করতে চেয়েছে। তিনি বলেন ঃ

ان من زعم ان هذه الاية مجملة فلم يفهم مقاطع الشريعة فان الله تعالى ارسل رسوله الى قوم هو منهم بلغتهم وانزل عليه كتابه تيسيرا منه بلسانه ولسانهم. والربا فى اللغة الرباوة والمراد به فى الاية كل زيادة لا يقابلها عوض -

অর্থাৎ যারা রিবার আয়াতকে অস্পষ্ট বলেছে, তারা শরীয়তের অকাট্য বিষয়সমূহ বুঝতে সক্ষম হয়নি। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রসূলকে একটি মানবগোষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরই ভাষায় প্রেরণ করেছেন। স্বীয় গ্রন্থ সহজ করার জন্য তাদেরই ভাষায় তার অবতারণ করেছেন। তাদের ভাষায় 'রিবা' শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। আয়াতে ঐ অতিরিক্তটুকুকে বোঝানো হয়েছে, যার বিপরীতে কোন সম্পদ নেই বরং মেয়াদ আছে।

ইমাম রাযী তফসীরে কবীরে বলেন, রিবা দু'রকম ঃ (এক) বাকী বিক্রয়ের রিবা এবং (দুই) নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে বেশী নেওয়ার রিবা। প্রথম প্রকার জাহিলিয়ত যুগে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। সে যুগের লোকেরা এরূপ লেনদেন করতো। দ্বিতীয় প্রকার রিবা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অমুক অমুক বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশী করা রিবার অন্তর্ভুক্ত।

আহ্কামুল-কোরআন জাস্সাসে বলা হয়েছে ঃ রিবা দু'রকম—একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে এবং অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। দ্বিতীয় প্রকারই ছিল জাহিলিয়ত যুগের রিবা। এর সংজ্ঞা এই যে, যে ঋণে মেয়াদের হিসাবে কোন মুনাফা নেওয়া হয়, তা-ই রিবা। ইবনে-রুশদ 'বিদায়াতুল-মুজতাহিদ' গ্রন্থে তা-ই লিখেছেন। তিনি এ রিবার অবৈধতা কোরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমার দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

ইমাম তোয়াহাভী 'শরহে মা'আনিউল-আসার' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ কোরআনে উল্লিখিত 'রিবা' দ্বারা পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে সে রিবাকেই বোঝান হয়েছে, যা ঋণের উপর নেওয়া হতো। জাহিলিয়ত যুগেও একেই রিবা বলা হতো। এরপর রসূল (সা)-এর বর্ণনা ও তাঁর সুন্নত থেকে অন্য প্রকার রিবার বিষয় জানা যায়, যা বিশেষ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের কম-বেশী করা কিংবা বাকী দেওয়ার পরিবর্তে নেওয়া হয়। এ রিবা হারাম হওয়া সম্পর্কেও অনেক সুপ্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু এ প্রকার রিবার বিস্তারিত বিবরণ না থাকার কারণে এতে কোন কোন সাহাবীর মনে খটকা দেখা দেয় এবং ফিকহ্বিদরা পরস্পরে মতভেদ করেন। (২৩২ পৃঃ, ২য় খণ্ড)

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ (র) 'হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ্' গ্রন্থে বলেন ঃ "এক প্রকার হচ্ছে সরাসরি ও প্রকৃত সুদ এবং অন্য এক প্রকার প্রকৃত বা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ ও

নির্দেশগত। সত্যিকার সুদ ঋণ দিয়ে বেশী নেওয়াকে বলা হয় এবং নির্দেশগত সুদ বলে হাদীসে বর্ণিত সুদকে বোঝান হয় অর্থাৎ কিছু সংখ্যক বিশেষ বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বেশী নেওয়া। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لا ربا الا فى النسيئة অর্থাৎ রিবা বা সুদ শুধু বাকী দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর অর্থও তা-ই যে, সত্যিকার ও আসল সুদ, যাকে সাধারণভাবে সুদ মনে করা ও বলা হয়, তা বাকী দিয়ে মুনাফা নেওয়াকেই বলা হয়। এছাড়া যত প্রকার সুদ এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, সবগুলো নির্দেশগত সুদের অন্তর্ভুক্ত।

এ বর্ণনা থেকে কয়েকটি বিষয় ফুটে উঠেছে ঃ প্রথমত, কোরআন অবতরণের পূর্বে রিবা একটি সুপরিচিত বিষয় ছিল। ঋণের ওপর মেয়াদের হিসাব বেশী নেওয়াকে রিবা বলা হতো।

দ্বিতীয়ত, কোরআনে রিবার নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরাম তা বর্জন করেন। এর অর্থ বোঝা ও বোঝানোর ব্যাপারে কারও মনে কোনরূপ খটকা বা সন্দেহ দেখা দেয়নি।

তৃতীয়ত, রসূলুল্লাহ্ (সা) ছয়টি বস্তু সম্পর্কে বলেছেন যে, এগুলোর পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়ের সমান হওয়া শর্ত। কম-বেশী হলে এবং বাকী দিলে রিবা হয়ে যাবে। এ ছয় বস্তু হল সোনা, রূপা গম, যব, খেজুর ও আঙুর। এ আইনের অধীনেই আরবে প্রচলিত 'মুযাবানা' ও 'মুহাকালা' ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ বক্তব্যের মাঝে বুঝবার ও চিন্তা-ভাবনার বিষয় ছিল এই যে, এ নির্দেশ বর্ণিত ছয়টি বস্তুর সাথেই সীমাবদ্ধ থাকবে, না অন্যান্য বস্তুতেও বিস্তার লাভ করবে? যদি তাই করে, তবে তা কোন্ বিধি অনুসারে? এ বিধির ব্যাপারে ফিকহ্‌বিদগণ চিন্তা-ভাবনা ও ইজতিহাদ করে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যেহেতু এ বিধি স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক বর্ণিত হয়নি, তাই হযরত ফারুকে আযম (রা) আফসোস করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেই এর কোন বিধি বর্ণনা করে দিলে কোনরূপ সন্দেহ বাকী থাকতো না। এরপর তিনি বলেছেন যে, যেখানে সুদের সন্দেহও হয়, সেখান থেকেও বেঁচে থাকা উচিত।

চতুর্থত, জানা গেল যে, আরবে পরিচিত সুদই ছিল আসল ও সত্যিকার 'রিবা' এবং একে ফিকহ্‌বিদগণ 'রিবাল-কোরআন' বা 'রিবাল-কর্জ' নামে অভিহিত করেছেন অর্থাৎ ঋণের উপর মেয়াদের হিসাবে মুনাফা নেওয়া। হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় প্রকার সুদ প্রথম প্রকারের সুদের সাথে যুক্ত এবং একই নির্দেশের আওতাভুক্ত। মুজতাহিদগণের মধ্যে যত মতভেদ হয়েছে, সব দ্বিতীয় প্রকার সুদের মধ্যেই হয়েছে। প্রথম প্রকার সুদ অর্থাৎ রিবাল-কোরআন যে হারাম, এ ব্যাপারে উম্মতে-মুহাম্মদীর মধ্যে কখনো কোন মতভেদ হয়নি।

আজকাল যে সুদকে প্রচলিত অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ মনে করা হয় এবং যে সুদের প্রশ্নটি এখানে আলোচনাধীন, সে সুদের অবৈধতা কোরআনের সাতটি আয়াত, চল্লিশটিরও বেশী হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

দ্বিতীয় প্রকার সুদ, যা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হয়, আজকাল এর ব্যাপক প্রচলন নেই। কাজেই এ নিয়ে আলোচনা করারও তেমন প্রয়োজন নেই।

এ পর্যন্ত কোরআন ও সুন্নাহ্তে সুদের স্বরূপ কি, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সুদ সংক্রান্ত আলোচনায় এটিই ছিল প্রথম বিষয়বস্তু।

সুদ নিষিদ্ধকরণের তাৎপর্য ও উপযোগিতা ঃ এরপর দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, সুদের অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা কোন্ রহস্য ও উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল, এতে কি কি আত্মিক অথবা অর্থনৈতিক অপকারিতা রয়েছে, যে কারণে ইসলাম একে এত বড় গোনাহ্ সাব্যস্ত করেছে ?

এ প্রসঙ্গে প্রথমে বুঝে নেওয়া দরকার যে, জগতের কোন সৃষ্ট বস্তু ও তার কাজ-কারবারই এমন নেই যে, যাতে কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্য বা উপকারিতা নেই। সাপ, বিচ্ছু, বাঘ, সিংহ এমনকি সংখিয়ার মত মারাত্মক বিষের মধ্যেও মানুষের হাজারো উপকারিতা নিহিত রয়েছে।

চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কোন-না-কোন উপকার খুঁজে বের করা কঠিন নয়। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়, যে জিনিসের মধ্যে উপকার বেশী এবং ক্ষতি কম, তাকে উপকারী ও উত্তম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যেসব জিনিসের অনিষ্ট ও অপকারিতা বেশী এবং উপকারিতা কম, সেগুলোকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়। কোরআন পাকও সুদ ও জুয়াকে হারাম করার সময় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এগুলোর মধ্যে গোনাহ্ ও মানুষের উপকার দুই-ই রয়েছে, কিন্তু গোনাহ্র পরিমাণ উপকারের তুলনায় অনেক বেশী। তাই এগুলোকে উত্তম ও উপকারী বলা যায় না, বরং ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক মনে করে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

'রিবা' অর্থাৎ সুদের অবস্থাও তদ্রূপ। এতে সুদখোরের সাময়িক উপকার অবশ্যই দেখা যায়। কিন্তু এর জাগতিক ও পারলৌকিক মন্দ পরিণাম এ উপকারের তুলনায় অত্যন্ত জঘন্য।

প্রত্যেক বস্তুর উপকার-অপকার ও লাভ-ক্ষতি তুলনা করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় হয়ে থাকে যে, যদি কোন বস্তুর উপকার অস্থায়ী ও সাময়িক হয় এবং অপকার দীর্ঘস্থায়ী কিংবা চিরস্থায়ী হয়, তবে একে কোন বুদ্ধিমান উপকারী বস্তুসমূহের তালিকায় গণ্য করতে পারে না। এমনিভাবে যদি কোন বস্তুর উপকার ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হয় এবং ক্ষতি সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপে, তবে একেও কোন সচেতন মানুষ উপকারী বলতে পারে না। চুরি ও ডাকাতিতে চোর ও ডাকাতের উপকার অনস্বীকার্য। কিন্তু তা সমগ্র জাতির জন্য ক্ষতিকর এবং তাদের শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্টকারী। তাই কোন মানুষই চুরি-ডাকাতিকে ভাল বলে না।

এ ভূমিকার পর সুদের প্রতি লক্ষ্য করুন। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, এতে সুদখোরের সাময়িক ও অস্থায়ী উপকারের তুলনায় তার আত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি

এত তীব্র যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি মানবতার গণ্ডির ভিতরে থাকতে পারে না। তার সাময়িক উপকারটিও শুধুমাত্র তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উপকার। কিন্তু এর ফলে গোটা জাতিকে বিরাট ক্ষতি ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকারে পরিণত হতে হয়। কিন্তু জগতের অবস্থা বিচিত্র বটে! এখানে কোন বস্তু একবার প্রচলিত হয়ে গেলে তার যাবতীয় অনিষ্ট-কারিতা যেন দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যায় এবং শুধু তার উপকারিতাই লক্ষ্যপথে থেকে যায়---তা যতই নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন। এর ক্ষতি ও অনিষ্টের প্রতি অধিকাংশ লোকই দৃষ্টিপাত করে না,---যদিও তা অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক হয়।

প্রথা ও প্রচলন মানব মনের জন্য একটি সূক্ষ্ম বিষক্রিয়া, যা মানুষকে অচেতন করে দেয়। অনেক কম ব্যক্তিই প্রথা ও প্রচলন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে একথা বুঝতে চেষ্টা করে যে, এতে উপকার কতটুকু আর ক্ষতিই বা কতটুকু? বরং কারও সতর্ক করার দরুন যদি ক্ষতিগুলো কারও দৃষ্টিতে ধরাও পড়ে, তবুও প্রথা ও প্রচলনের অনুবর্তিতা তাকে সঠিক পথে আসতে দেয় না।

বর্তমান যুগে সুদ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সমগ্র বিশ্ব এর রাহুগ্রাসে পতিত। এটি মানব স্বভাবের রুচিকে বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে মানুষ তিক্তকে মিষ্ট মনে করতে শুরু করেছে এবং যে বিষয়টি সমগ্র মানবতার জন্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ, তাকেই তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ভাবতে শুরু করেছে। আজ কোন চিন্তাবিদ এর বিপক্ষে আওয়াজ তুললে তাকে অপরিণামদর্শী অবাস্তব চিন্তাধারার লোক বলেই অভিহিত করা হয়।

কিন্তু যে চিকিৎসক কোন দেশে ব্যাপকাকারে মহামারী ছড়িয়ে পড়তে এবং চিকিৎসা ব্যর্থ হতে দেখে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, এ রোগ রোগই নয়; বরং সুস্থতা ও সাক্ষাৎ আরাম, সে প্রকৃত অর্থে চিকিৎসকই নয়; বরং মানবতার সাক্ষাৎ শত্রু। পারদর্শী চিকিৎসকের কাজ এ সময়েও এ ছাড়া অন্য কিছুই নয় যে, সে মানুষকে এ রোগ ও তার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং প্রতিকারের পন্থা বলতে থাকবে।

আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালাম মানব চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব নিয়ে আগমন করে-ছেন। তাঁদের কথা কেউ শুনবে কি না---তাঁরা এর পরওয়া করেন নি। তাঁরা যদি মানুষের শোনার ও মান্য করার অপেক্ষা করতেন, তবে সারা বিশ্ব কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ থাকতো। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রচারকার্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন, তখন কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র মান্যকারী কে ছিল?

সুদকে যদিও বর্তমান অর্থনীতির মেরুদণ্ড মনে করা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব সত্য আজও কোন কোন পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিত স্বীকার করছেন। তাঁদের মতে সুদ অর্থনীতির মেরুদণ্ড নয়; বরং মেরুদণ্ডে সৃষ্ট এমন একটা দুষ্ট ক্ষত, যা অহরহ তাকে খেয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকালকার অনেক বিচক্ষণ লোকও কোন সময় প্রথা ও প্রচলনের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে এদিকে লক্ষ্য করেন না যে, সুদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কি? দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাও এসব বিচক্ষণদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করে না

যে, সুদের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষ এবং গোটা জাতি দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকার হয়ে যায়। দরিদ্র আরও দরিদ্র হতে থাকে এবং গুটিকতক পুঁজি-পতি জাতির অর্থ দ্বারা উপকৃত হয়ে বরং বলা উচিত যে, জাতির রক্ত শোষণ করে স্ফীত হতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, যখন এসব বুদ্ধিজীবীর সামনে এ সত্যটি তুলে ধরা হয়, তখন তারা একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য আমাদেরকে পাশ্চাত্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুদের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করতে উপদেশ দেন এবং দেখাতে চান যে, তারা সুদভিত্তিক অর্থনীতির কল্যাণেই এমন সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। কিন্তু এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন নরখাদক সম্প্রদায় তাদের এ অভ্যাসের উপকারিতা দেখানোর জন্য আপনাকে নরখাদকদের মহল্লায় নিয়ে গেলো এবং দেখালো যে, এরা কেমন মোটা-তাজা, সবল ও সুস্থ। এরপর সে প্রমাণ করে যে, এদের অভ্যাস-আচরণই অনুসরণীয় ও উত্তম আচরণ।

কিন্তু কোন সমঝদার লোকের সাথে এ ব্যক্তির মোকাবিলা হলে সে বলবে : তুমি এ নরখাদকদের ক্রিয়াকর্মের বরকত এদের মহল্লায় নয়---অন্য মহল্লায় গিয়ে দেখ। সেখানে দেখবে, শত শত হাজার হাজার নরকংকাল পড়ে রয়েছে। এদের রক্ত ও মাংস খেয়ে খেয়ে এ হিংস্ররা লালিত-পালিত হয়েছে। ইসলাম ও ইসলামী শরীয়ত কখনও এরূপ কার্যকে উপকারী বলে মেনে নিতে পারে না, যার ফলশ্রুতিতে সমগ্র মানব সমাজ বিপর্যয়ের শিকার হয় এবং কিছুসংখ্যক লোক ও তাদের তল্পী বাহকরা সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকে।

সুদের অর্থনৈতিক অনিষ্টকারিতা : সুদের ফলে গুটিকতক লোকের উপকার এবং সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয়---এ ছাড়া সুদের মধ্যে যদি অন্য কোন দোষ নাও থাকতো তবে এ দোষটিই সুদ নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। অথচ এতে এ ছাড়া আরও অর্থনৈতিক অনিষ্ট এবং আত্মিক বিপর্যয় বিদ্যমান রয়েছে।

সুদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির বিপর্যয় ঘটিয়ে বিশেষ একটি শ্রেণীর উপকার কিভাবে হয়, প্রথমে তাই দেখা যাক। সুদের মহাজনী ও অধুনালুপ্ত পদ্ধতি এমন বিশ্রী ছিল যে, বৃহত্তম মানব সমাজের ক্ষতি ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের উপকারের বিষয়টি যে কোন স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও বোঝা কঠিন ছিল না। কিন্তু আজকালকার নতুন প্রেক্ষা-পটে যেভাবে মদকে মেশিনে পরিশোধিত করে, ডাকাতির নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে এবং ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার নতুন নতুন কৌশল বের করে এ সবগুলোকেই সভ্যতার খোলস পরিয়ে দিয়েছে—যাতে এদের অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টি-গোচর না হয়, তেমনিভাবে সুদের জন্য ব্যক্তিগত গদির পরিবর্তে যৌথ কোম্পানী গঠন করেছে---যাকে ব্যাংক বলা হয়। এখন জগদ্বাসীর চোখে ধূলি দেওয়ার জন্য বলা হয় যে, সুদের এ আধুনিক পদ্ধতি দ্বারা সমগ্র জাতির উপকার হয়। কেননা, যে জনগণ নিজ টাকা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে জানে না কিংবা স্বল্প পুঁজির কারণে করতে পারে না, তাদের সবার টাকা-পয়সা ব্যাংকে জমা হয়ে প্রত্যেকেই অল্প হলেও কিছু না কিছু মুনাফা পেয়ে যায়। বড় বড় ব্যবসায়ীরাও ব্যাংক থেকে সুদের উপর ঋণ নিয়ে বড় ব্যবসা করে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। এভাবে সুদ বর্তমানে একটি কল্যাণকর বস্তুতে পরিণত হয়েছে এবং গোটা জাতি এর দ্বারা উপকার পাচ্ছে।

কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে এটি একটি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। মদের দুর্গন্ধময় দোকানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেলে এবং পতিতাবৃত্তির আড্ডাগুলোকে সিনেমা ও নৈশ ক্লাবে রূপান্তরিত করে, বিষকে প্রতিষেধক এবং ক্ষতিকরকে উপকারীরূপে দেখাবার প্রয়াসে এ প্রতারণাকে কাজে লাগানো হয়েছে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের সামনে যেমন একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, চরিত্রবিধ্বংসী অপরাধসমূহকে আধুনিক পোশাক পরিয়ে দেওয়ার ফলে যেমন এসব অপরাধের ব্যাপকতা পূর্বের চাইতে বেড়েই গেছে, তেমনি সুদখোরীর এ নতুন পদ্ধতি---শতকরা কয়েক টাকা সুদ জনগণের পকেটে পুরে দিয়ে একদিকে তাদেরকে এ জঘন্য অপরাধে শরীক করেছে এবং অপরদিকে নিজেদের জন্য এ অপরাধের অসীম ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিয়েছে।

কে না জানে যে, জনগণ সেভিংস ব্যাংক ও পোস্ট অফিস থেকে যে শতকরা কয়েক টাকা সুদ পায়, তদ্দ্বারা কিছুতেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না। তাই তারা ভরণ-পোষণের জন্য কোন মজুরি কিংবা চাকুরী খুঁজতে বাধ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে প্রথমত তাদের দৃষ্টি যায় না। যদি কেউ এদিকে মনোনিবেশও করে তবে গোটা জাতির পুঁজি ব্যাংকে জমা হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য যে আকার ধারণ করেছে, তাতে কোন স্বল্প পুঁজির অধিকারীর পক্ষে ব্যবসায়ে প্রবেশ করা স্বপ্ন-বিলাসের পর্যায়েই থেকে যায়। কেননা, যে ব্যবসায়ীর বাজারে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এবং বড় কারবার আছে, ব্যাংক তাকেই বড় পুঁজি ঋণ দিতে পারে। দশ লক্ষের মালিক এক কোটি ঋণ পেতে পারে। সে তার ব্যক্তিগত টাকার তুলনায় দশগুণ বেশী টাকার ব্যবসা চালাতে পারে। পক্ষান্তরে স্বল্প পুঁজির অধিকারী ব্যক্তির কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিই থাকে না এবং ব্যাংকও তাকে বিশ্বাস করে না যে, পুঁজির দশগুণ বেশী দিয়ে দেবে। এক লাখ দূরের কথা, তার এক হাজার পাওয়াই কঠিন। মনে করুন, কেউ এক লাখ টাকা ব্যাংকের পুঁজি খাটিয়ে দশ লাখ টাকার ব্যবসা করে। যদি তার শতকরা এক টাকা মুনাফা হয়, তবে তার নিজস্ব এক লাখ টাকায় যেন শতকরা দশ টাকা মুনাফা হলো। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি শুধু ব্যক্তিগত টাকা দ্বারা এক লাখ টাকার ব্যবসা করে, তবে এক লাখের মুনাফা শতকরা এক টাকাই হবে। এ মুনাফা তার প্রয়োজনীয় খরচাদির জন্যও হয়ত যথেষ্ট নয়। এদিকে বাজারে বড় পুঁজিপতি যে দর ও রেয়াতসহ কাঁচামাল পায়, ছোট পুঁজিপতি তা পায় না। ফলে স্বল্প পুঁজিওয়ালা পঙ্গু ও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। যদি তার কপাল মন্দ হয় এবং সেও কোন বড় ব্যবসায়ে প্রবেশ করে, তবে বৃহৎ পুঁজিপতিরা তাকে অনধিকার প্রবেশকারী মনে করে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও বাজার এমন পর্যায়ে নিয়ে আসে যে, ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা আসল ও মুনাফা উভয়ই খুইয়ে বসে। ফলে বৃহৎ পুঁজিপতিদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

জাতির প্রতি এটা কত বড় অবিচার যে, গোটা জাতি প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধু বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে! তারা বখ্‌শিশ হিসেবে যতটুকু ইচ্ছা তাদেরকে মুনাফা দেবে।

এর চাইতেও বড় দ্বিতীয় আর একটি ক্ষতির কবলে সারাদেশ পতিত হয়ে আছে। তা এই যে, উপরোক্ত অবস্থায় বৃহৎ পুঁজিপতিরাই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের অধিকারী হয়ে যায়। তারা উচ্চতর মূল্যে বিক্রয় করে স্বীয় গাঁট মজবুত করে নেয় এবং জাতির গাঁট খালি করে দেয়। তারা মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য যখন ইচ্ছা মাল বিক্রি-বন্ধ করে দেয়। যদি গোটা জাতির পুঁজি ব্যাংকের মাধ্যমে টেনে এসব স্বার্থপরদের লালন-পালন না করা হতো এবং সবাই ব্যক্তিগত পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করতে বাধ্য হতো, তবে ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা এ বিপদের সম্মুখীন হতো না এবং এসব স্বার্থপর হিংস্ররাও গোটা ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্ণধার হয়ে বসতে পারতো না। ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের ব্যবসায়ের মুনাফা জমকালো হলে অন্যরাও সাহস করত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপক হয়ে যেত। এতে করে প্রত্যেকের পক্ষেই কিছু কিছু লোক নিয়োগ করার সুযোগ হত। এতে অনেক বেকার সমস্যারও সমাধান হত এবং বাণিজ্যিক মুনাফাও ব্যাপক হয়ে পড়ত। এছাড়া দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতেও এর নিশ্চিত প্রভাব পড়ত। কেননা, পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই ব্যবসায়ীরা কম মুনাফা অর্জনে সম্মত হয়। এ প্রতারণামূলক কর্মপদ্ধতি গোটা জাতিকে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত করে দিয়েছে এবং তাদের চিন্তাধারাকেও বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে তারা এ রোগকেই সুস্থতা মনে করে বসেছে।

ব্যাংকের সুদ দ্বারা জাতির তৃতীয় অর্থনৈতিক ক্ষতিও লক্ষণীয়। যার পুঁজি দশ হাজার এবং সে ব্যাংক থেকে সুদের উপর কর্জ নিয়ে এক লাখের ব্যবসা করে, যদি কোথাও তার পুঁজি ডুবে যায় এবং ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সে দেউলিয়া হয়ে যায়, তবে চিন্তা করুন, ক্ষতির শতকরা দশ ভাগ তার নিজস্ব এবং অবশিষ্ট শতকরা নব্বই ভাগই গোটা জাতির হয়েছে, যাদের পুঁজি ব্যাংক থেকে নিয়ে সে ব্যবসা করেছিল। যদি ব্যাংক নিজেই দেউলিয়ার ক্ষতি বহন করে, তবে ব্যাংক তো জাতিরই পকেট। পরিণামে এ ক্ষতি জাতিরই হবে। এর সারমর্ম হলো এই যে, যতক্ষণ মুনাফা হচ্ছিল, ততক্ষণ সে একা ছিল মুনাফার মালিক, তাতে জাতির কোন অংশ ছিল না এবং যেই ক্ষতি হলো, তখন শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষতি জাতির ঘাড়ে চেপে বসলো।

সুদের আরও একটি অর্থনৈতিক ক্ষতি এই যে, সুদখোর যখন অবক্ষয়ে পড়ে, তখন তার পুনরায় মাথা তোলার যোগ্যতা থাকে না। কেননা,ক্ষতি বরদাশত করার মত পুঁজি যে তার ছিলই না। ক্ষতির সময় তার উপর দ্বিগুণ বিপদ চাপে। একে তো নিজের মুনাফা ও পুঁজি গেল, তদুপরি ব্যাংকের ঋণও চেপে বসল। এ ঋণ পরিশোধের কোন উপায় তার কাছে নেই। সুদহীন ব্যবসায়ে যদি কোন সময় সমগ্র পুঁজিও বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে এর দ্বারা মানুষ ফকীর হয় না—ঋণী হয়।

১৯৫৪ সনে পাকিস্তানে তুলা ব্যবসায়ে কোরআনের ভাষায় 'মুহাক' তথা অবক্ষয়ের বিপদ দেখা দেয়। সরকার কোটি কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করে ব্যবসায়ীদেরকে সামাল দেন। কিন্তু কেউ এ ব্যাপারে চিন্তা করেনি যে, এটা ছিল সুদের অশুভ পরিণতি। তুলা ব্যবসায়ীরা এ কারবারের অধিকাংশ পুঁজি ব্যাংকের ঋণ থেকে নিয়োগ করেছিল। নিজস্ব পুঁজি ছিল নামেমাত্র। আল্লাহ্‌র মর্জিতে তুলার বাজারে এমন

মন্দা দেখা দেয় যে, দর ১২৫·০০ থেকে ১০·০০ টাকায় নেমে আসে। ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের ঋণ পূর্ণ করার জন্য টাকা ফেরত দেওয়ারও যোগ্য ছিল না। তারা বাধ্য হয়ে তুলার বাজার বন্ধ করে দিল। সরকার ১০ এর পরিবর্তে ৯০ টাকা দরে মাল কিনে নিল এবং কোটি কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করে ব্যবসায়ীদেরকে দেউলিয়াত্বের কবল থেকে উদ্ধার করে নিল। সরকারের টাকা কার ছিল? দরিদ্র জনগণেরই। মোট-কথা, ব্যাংকসমূহের কারবারের পরিষ্কার ফল এই যে, জনগণের পুঁজি দ্বারা গুটিকতক লোক মুনাফা উপার্জন করে এবং ক্ষতি হয়ে গেলে তা জনগণের ঘাড়েই চাপে।

আত্মসেবা ও জাতি হত্যার আরও একটি অপকৌশল

সুদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির সর্বনাশ সাধন করে কতিপয় ব্যক্তির আত্মসেবার সংক্ষিপ্ত চিত্র পেশ করা হলো। এর সাথে আরও একটি প্রতারণা লক্ষণীয়। সুদ-খোররা যখন অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝতে পারল যে, কোরআনের উক্তি يمحق الله الربوٰ অক্ষরে অক্ষরে সত্য অর্থাৎ মালের অবক্ষয় আসা অবশ্যম্ভাবী, যার ফলে দেউলিয়া হতে হয়, তখন এসব অবক্ষয়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা দু'টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললো। একটি বীমা, অপরটি 'স্টক-এক্সচেঞ্জ'। কেননা, ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ার দু'টি কারণ হতে পারে। একটি দৈব-দুর্বিপাক যথা, জাহাজ ডুবে যাওয়া, অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি এবং অপরটি পণ্যদ্রব্যের দাম ক্রয়-মূল্যের নিচে নেমে আসা। বিনিয়োগকৃত পুঁজি যেহেতু নিজস্ব নয়—জাতির যৌথ সম্পদ, তাই উভয় অবস্থাতে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি কম এবং জাতির বেশী হয়। কিন্তু তারা এ অল্প ক্ষতির বোঝাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য একদিকে বীমা কোম্পানী খুলেছে যাতে ব্যাংকের মত সমগ্র জাতির পুঁজি নিয়োজিত থাকে। দৈব-দুর্বিপাকে সুদখোরদের ক্ষতি হয়ে গেলে, বীমার মাধ্যমে সমগ্র জাতির যৌথ পুঁজি থেকে তাকে উদ্ধার করে নেওয়া হয়।

জনগণ মনে করে, বীমা কোম্পানীগুলো আল্লাহ্‌র রহমত, ডুবন্ত ব্যক্তির আশ্রয়-স্থল। কিন্তু এদের স্বরূপ দেখলে ও বুঝলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এখানেও প্রতারণা ছাড়া কিছুই নেই। আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় সাহায্যের লোভ দেখিয়ে জাতির পুঁজি সঞ্চয় করা হয়, কিন্তু এর মোটা অংকের টাকা দ্বারা বৃহৎ ব্যবসায়ীরাই উপ-কৃত হয়। তারা মাঝে-মাঝে নিজেই স্বীয় ক্ষয়প্রাপ্ত মোটরে অগ্নিসংযোগ করে কিংবা কোন কিছুর সাথে ধাক্কা লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয় এবং বীমা কোম্পানী থেকে টাকা আদায় করে নতুন মোটর ক্রয় করে। শতকরা দু'-একজন গরীব হয়তো আকস্মিক মৃত্যুর কারণে কিছু টাকা পেয়ে যায়।

অপরদিকে দর কমে যাওয়ার বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা স্টক-এক্স-চেঞ্জের বাজার গরম করেছে। এ বিশেষ প্রকার জুয়া দ্বারা গোটা জাতিকে প্রভাবান্বিত করা হয়েছে, যাতে মূল্য হ্রাসের কারণে যে ক্ষতির আশংকা রয়েছে, তাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়।

এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকের সুদ ও বাণিজ্য গোটা মানব সমাজের দারিদ্র্য ও আর্থিক দুরবস্থার কারণ। হাঁ, গুটিকতক ধনীর ধন-সম্পদ এর দৌলতে আরও বেড়ে যায়। জাতির ধ্বংস এবং গুটিকতক লোকের উন্নতিই এর ফলশ্রুতি। এ বিরাট অনিষ্ট সাধারণ সরকারসমূহের দৃষ্টি এড়ায়নি। এর প্রতিকারার্থে তারা বৃহৎ পুঁজিপতিদের আয়করের হার বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এমনকি, সর্বশেষ হার টাকায় সারে পনর আনা করা হয়েছে, যাতে পুঁজি তাদের হাত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আবার জাতীয় তহবিলে পৌঁছে যায়।

কিন্তু সবাই জানেন যে, এ আইনের ফলেই সাধারণভাবে মিল-কারখানার হিসাবে জালিয়াতি হচ্ছে এবং সরকারের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য ও হিসাবাদি গোপন করার উদ্দেশ্যে অনেক পুঁজি গুপ্তধনের আকারে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

মোটকথা, ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে কয়েক ব্যক্তির হাতে আবদ্ধ হওয়া যে দেশের অর্থনীতির জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ, এ সম্পর্কে সবাই পরিজ্ঞাত আছেন। এ কারণেই আয়করের হার বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এ কর্মপন্থাও রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। রোগের আসল কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থতাই এর বড় কারণ। কাজেই এ প্রতিকার যেন دربہ بست و دشمن اندر خانہ بود অর্থাৎ শত্রুকে ভিতরে রেখেই গৃহের দরজা এঁটে দেওয়ার মত হয়ে গেছে।

ধন-সম্পদ বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত হওয়ার কারণ শুধু সুদের ব্যবসায় এবং জাতীয় সম্পদ দ্বারা একটা বিশেষ শ্রেণীর অন্যায় মুনাফাখোরী। যতদিন পর্যন্ত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সুদের কারবার বন্ধ করা না হয় এবং নিজ নিজ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করার নীতি প্রচলিত না করা হয়, ততদিন এ রোগের প্রতিকার অসম্ভব।

একটি সন্দেহ ও তার উত্তর ঃ এ স্থানে প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, ব্যাংকের মাধ্যমে গোটা জাতির পুঁজি সঞ্চিত হয়ে কিছু-না-কিছু উপকার তো জনগণেরও হয়েছে যদিও তা খুব কম। অবশ্য এটা সত্য যে, বৃহৎ পুঁজিপতিরা এর দ্বারা বেশী উপকৃত হয়েছে। তবে হ্যাঁ, যদি ব্যাংকে সম্পদ সঞ্চিত করার রীতি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে এর ফল আগেকার যুগের মতই হবে অর্থাৎ জনগণের সম্পদ গুপ্তধন ও গুপ্তভাণ্ডারের আকারে ভূগর্ভে চলে যাবে। এতে না জনগণের উপকার হবে, না অন্য কারো।

এর উত্তর এই যে, ইসলাম সুদ হারাম করে যেমন সমগ্র জাতির সম্পদ বিশেষ বিশেষ পুঁজিপতির হাতে আবদ্ধ হওয়ার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, তেমনি পুঁজি-করের আকারে যাকাত আরোপ করে প্রত্যেক ধনীকে সম্পদ স্থাবর অবস্থায় না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত রাখতে বাধ্য করেছে। কেননা, পুঁজি-করের আকারে যাকাত আরোপিত হওয়ার কারণে যদি কোন ব্যক্তি টাকা-পয়সা অথবা সোনা-রূপা মাটির নিচে পুঁতে রাখে, তবে প্রতি বছর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত যেতে যেতে তার মূল নিঃশেষ হয়ে যাবে। কাজেই প্রত্যেক বুদ্ধিবান ব্যক্তিই পুঁজিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত করে তদ্দ্বারা নিজে উপকৃত হতে, অপরের উপকার করতে এবং মুনাফা থেকেই যাকাত আদায় করতে বাধ্য হবে।

যাকাত একদিক দিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির নিশ্চয়তা দেয়ঃ এ থেকে আরও জানা গেল যে, যাকাত প্রদানের মধ্যে যেমন জাতির অক্ষম শ্রেণীর সাহায্য করার মত বিরাট উপকার নিহিত রয়েছে, তেমনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি চমৎকার প্রক্রিয়া। কেননা, প্রত্যেকেই যখন দেখবে যে, নগদ পুঁজি আবদ্ধ রাখার ফলে মুনাফা তো দূরের কথা, বছরান্তে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে, তখন অবশ্যই সে এ পুঁজি কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত করার জন্য সচেষ্ট হবে। হারাম সুদ থেকে বাঁচার জন্য ব্যবসায়ের আকার-প্রকৃতি এরূপ হবে না যে, লাখো মানুষের পুঁজি দ্বারা শুধু এক ব্যক্তিই ব্যবসা করবে, বরং প্রত্যেকেই নিজে বিনিয়োগের চিন্তা করবে। বৃহৎ পুঁজিপতিরাও যখন নিজ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করবে, তখন ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা ব্যবসা ক্ষেত্রে ঐসব অসুবিধার সম্মুখীন হবে না যা ব্যাংক থেকে সুদের টাকা নিয়ে ব্যবসা করলে দেখা দেয়। এভাবে দেশের আনাচে-কানাচে প্রত্যন্ত এলাকাতেও ব্যবসা এবং বিভিন্ন-মুখী বিনিয়োগ প্রচেষ্টা ছড়িয়ে পড়বে এবং এর ফলে সর্বশ্রেণীর মানুষ উপকৃত হবে।

সুদের আত্মিক ক্ষতিঃ এ পর্যন্ত সুদের অর্থনৈতিক ধ্বংসকারিতা বর্ণিত হলো। এবার সুদের কারবার মানুষের চারিত্রিক ও আত্মিক অবস্থার উপর কিরূপ অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

১. মানবচরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ হচ্ছে আত্মত্যাগ ও দানশীলতা অর্থাৎ নিজে কষ্ট করে হলেও অপরকে সুখী করার প্রেরণা। সুদের ব্যবসায়ের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে এ প্রেরণা লোপ পায়। সুদখোর ব্যক্তি অপরের উপকার করা তো দূরের কথা, অপরকে নিজ চেষ্টায় ও নিজ পুঁজি দ্বারা তার সমতুল্য হতে দেখলে তাও সহ্য করতে পারে না।

২. সুদখোরেরা কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার পরিবর্তে তার বিপদের সুযোগে অবৈধ মুনাফা লাভের চেষ্টায় মত্ত থাকে।

৩. সুদ খাওয়ার ফলশ্রুতিতে অর্থলালসা বেড়ে যায়। সে এতে এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, ভালমন্দেরও পরিচয় থাকে না এবং সুদের অশুভ পরিণামের প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে।

সুদ ছাড়া কি কোন ব্যবসা চলতে পারে নাঃ সুদের স্বরূপ এবং এর জাগতিক ও ধর্মীয় অনিষ্টকারিতা বিস্তারিতভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এখন তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হলো এই যে, অর্থনৈতিক ও আত্মিক অনিষ্টকারিতা এবং কোরআন ও সুন্নাহ্তে এ সম্পর্কিত কঠোর নিষেধাজ্ঞা জানা গেল। কিন্তু বর্তমান যুগে সুদই হচ্ছে কাজ-কারবারের প্রধান অবলম্বন। সারা বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য সুদের উপরই চলছে। এ থেকে মুক্তি লাভের উপায় কি? বর্তমান যুগে ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক বর্জন করার অর্থ ব্যবসায়ের তল্পিতল্পা গুটানো।

এর জওয়াব এই যে, কোন রোগ যখন ব্যাপক হয়ে মহামারীর আকার ধারণ করে, তখন তার চিকিৎসা কঠিন অবশ্যই হয়; কিন্তু নিষ্ফল কখনো হয় না। নিষ্ঠার সাথে যে কোন সংশোধন প্রচেষ্টাই পরিণামে সফল হয়। তবে এজন্যে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং সাহসিকতা অবশ্যই প্রয়োজন। কোরআন পাকেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ০ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের কোনরূপ সংকীর্ণতায় ফেলেন নি। তাই সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য এমন কোন কার্যকর ও ফলপ্রসূ পথ অবশ্যই রয়েছে, যাতে অর্থনৈতিক ক্ষতিও নেই, অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের দ্বারও রুদ্ধ হয় না এবং সুদ থেকে মুক্তিও পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা এই যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বর্তমান পদ্ধতি দেখে বাহ্য দৃষ্টিতে মনে করা হয় যে, সুদের উপরই ব্যাংক নির্ভরশীল; সুদ ছাড়া ব্যাংক চলতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা নিশ্চিতরূপে নির্ভুল নয়। সুদ ছাড়াও ব্যাংক ব্যবস্থা এমনিভাবে ফলপ্রসূ ও কার্যকরী ভূমিকা সহকারেই কায়েম থাকতে পারে; শুধু তাই নয় বরং আরও উত্তম উপকারী ভূমিকা নিয়েই তা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। তবে এর জন্য কিছুসংখ্যক শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও কিছুসংখ্যক ব্যাংক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাঁরা নতুনভাবে এর পদ্ধতি নির্ধারণ করলে সাফল্য দূরে নয়। শরীয়তের নিয়মানুযায়ী ব্যাংক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করবে যে, এতে জাতির কিরূপ মঙ্গল সাধিত হয়। ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করার পদ্ধতি ও নীতি ব্যাখ্যা করার স্থান এটা নয়, তাই এ সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে।[১]

কিছু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সুদের প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্যাংকের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন করে এর ব্যবস্থা করা যায়। সুদের দ্বিতীয় প্রয়োজন অসহায় দরিদ্র লোকদের সাময়িক অভাব পূরণ করা। এর চমৎকার প্রতিকার ইসলামেই পূর্ব থেকে যাকাত ও ওয়াজিব সদকার আকারে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ধর্ম ও ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা আজকাল যাকাত ব্যবস্থাকেও পঙ্গু করে দিয়েছে। অসংখ্য মুসলমান নামাযের মত যাকাতের ধারে-কাছেও যায় না। যারা যাকাত দেয়, তাদের মধ্যে অনেক বৃহৎ পুঁজিপতি হিসাব করে পূর্ণ যাকাতও প্রদান করে না। যারা সম্পূর্ণ যাকাত প্রদান করে, তারা শুধু যাকাত পকেট থেকে বের করতেই জানে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা শুধুমাত্র যাকাত পকেট থেকে বের করারই নির্দেশ দেন নি---তা আদায় করারও নির্দেশ দিয়েছেন। প্রদত্ত যাকাত যথার্থ হকদারকে পৌঁছিয়ে তার অধিকারভুক্ত করে দিলেই যাকাত আদায় করা শুদ্ধ হতে পারে। সুতরাং চিন্তা করার বিষয় হলো, এমন মুসলমান

---

১. বেশ কিছু দিন পূর্বে কয়েকজন আলেমের পরামর্শক্রমে আমি সুদবিহীন ব্যাংক-ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটা পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। কোন কোন ব্যাংক-বিশেষজ্ঞ একে বর্তমান যুগে বাস্তবায়নযোগ্য বলেও স্বীকার করেছিলেন এবং কেউ কেউ একে শুরু করার জন্য উদ্যোগী ভূমিকাও গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সাধারণ ব্যবসায়ীদের আনুকূল্য এবং সরকারী মঞ্জুরীর অভাবে চালু হতে পারেনি।

কয়জন আছে, যারা যথার্থ হকদার খুঁজে তাদের কাছে যাকাত পৌঁছিয়ে দিতে যত্নবান। মুসলমান জাতি যতই গরীব হোক, যাদের উপর যাকাত ফরয, তারা প্রত্যেকেই যদি পুরোপুরি যাকাত প্রদান করে এবং বিশুদ্ধ পন্থায় স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তবে কর্জের তাগিদে সুদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন কোন মুসলমানেরই থাকতে পারে না। যদি শরীয়তের বিধি অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যায়, এর অধীনে বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানদের ধন-সম্পদের যাকাত এতে জমা হয়, তবে বায়তুল-মাল থেকে প্রত্যেক অভাবগ্রস্তেরই অভাব পূরণ করা সম্ভব। বেশী টাকার প্রয়োজন হলে সুদবিহীন কর্জও প্রদান করা যেতে পারে। এভাবে বেকার ও কর্মহীনদের ছোট ছোট দোকান করে দিয়ে কিংবা কোন শিল্পকর্মে নিয়োগ করেও কাজে লাগানো যায়। জনৈক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ঠিকই বলেছেন যে, মুসলমানরা যাকাত-ব্যবস্থার অনুবর্তী হয়ে গেলে তাদের মধ্যে কোন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত লোক দেখা যাবে না।

মোটকথা, বর্তমান যুগে সুদকে মহামারী আকারে প্রসার লাভ করতে দেখে এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, সুদের ব্যবসা বর্জন করা অর্থনৈতিক আত্মহত্যার নামান্তর এবং এ যুগের লোক সুদের ব্যবসায়ের ব্যাপারে ক্ষমার্হ।

হ্যাঁ, এটা অবশ্য ঠিক যে, যতদিন সমগ্র জাতি কিংবা উল্লেখযোগ্য দল কিংবা কোন ইসলামী সরকার পূর্ণ মনোযোগ সহকারে এ কাজে সংকল্পবদ্ধ না হয়, ততদিন দু'-চার-দশজনের পক্ষে সুদ বর্জন করা কঠিন, কিন্তু ক্ষমার্হ তবুও বলা যায় না।

আমাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য দু'টি ঃ প্রথমত, মুসলমানদের বিভিন্ন দল ও সরকার-সমূহকে এদিকে আকৃষ্ট করা। কেননা, তারাই এ কাজ যথার্থভাবে করতে পারে এবং তাদের উদ্যোগ শুধু মুসলমানদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকেই সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কমপক্ষে সবার জ্ঞান বিশুদ্ধ হোক এবং তারা রোগকে সত্যিকার-ভাবেই রোগ মনে করুক। কেননা, হারামকে হালাল মনে করা দ্বিতীয় গোনাহ্। এটা সুদের গোনাহ্র চাইতেও বড় ও মারাত্মক। তারা কমপক্ষে এ গোনাহে লিপ্ত না হোক। গোনাহে কিছু-না-কিছু বাহ্যিক উপকারও আছে। কিন্তু যেটা জ্ঞানগত ও বিশ্বাসগত গোনাহ্ অর্থাৎ হারামকে হালাল প্রমাণিত করার চেষ্টা করা, এটা প্রথম গোনাহ্র চাইতেও মারাত্মক এবং নিরর্থক। কেননা সুদকে হারাম মনে করা এবং স্বীয় গোনাহ্ স্বীকার করার মধ্যে কোন আর্থিক ক্ষতিও হয় না। এবং এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যও বন্ধ হয়ে যায় না। হ্যাঁ, অপরাধ স্বীকার করার ফল এটা অবশ্যই যে, কোন সময় তওবা করার তওফীক হলে সুদ থেকে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করা যাবে।

এ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই উপসংহারে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করছি। এগুলো সুদ সম্পর্কিত আলোচ্য আয়াতসমূহেরই বর্ণনা। উদ্দেশ্য, গোনাহ্ যে গোনাহ্ —এ অনুভূতি জাগ্রত হোক, এ থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা হোক, কমপক্ষে হারামকে হালাল করে এক গোনাহ্কে দুই গোনাহ্ না করুক। বড় বড় নেক ও দ্বীনদার মুসলমান রাত্রিবেলা তাহা-জ্জুদ ও যিকিরে অতিবাহিত করে। সকাল বেলায় যখন তারা দোকানে কিংবা কারখানায়

পৌঁছে, তখন এ কল্পনাও তাদের মনে জাগে না যে, তারা সুদ ও জুয়ার কাজ-কারবারে লিপ্ত হয়ে কিছু গোনাহ্ করে চলছে।

সুদ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী

১. রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ সাতটি মারাত্মক বিষয় থেকে বেঁচে থাক। সাহাবায়ে-কিরাম জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)! সেগুলো কি? তিনি বললেনঃ (১) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে (ইবাদতে কিংবা বিশেষ বিশেষ গুণাবলীতে) অন্য কাউকে অংশীদার করা, (২) যাদু করা, (৩) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) এতীমের মাল খাওয়া, (৬) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং (৭) কোন সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা!---(বুখারী, মুসলিম)

২. রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আমি আজ রাত্রে দেখেছি দু'ব্যক্তি আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে গেছে। এরপর আমরা সামনে অগ্রসর হলে একটি রক্তের নদী দেখলাম। নদীর মধ্যে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান। অপর এক ব্যক্তি নদীর কিনারে দণ্ডায়মান। নদীস্থিত ব্যক্তি যখন নদী থেকে উপরে উঠতে চায়, তখন কিনারের ব্যক্তি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে। পাথরের আঘাত খেয়ে সে আবার পূর্বের জায়গায় চলে যায়। অতঃপর সে আবার তীরে ওঠার চেষ্টা করে। কিনারের ব্যক্তি আবার তার সাথে একই ব্যবহার করে। মহানবী (সা) বলেনঃ আমি স্বীয় সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলামঃ আমি এ কি ব্যাপার দেখছি? তারা বলল, রক্তের নদীতে বন্দী ব্যক্তি সুদ-খোর। সে স্বীয় কার্যের শাস্তি ভোগ করছে।---(বুখারী)

৩. রসূলুল্লাহ (সা) সুদগ্রহীতা ও সুদদাতা---উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সুদের লেন দেনে সাক্ষ্যদাতা এবং দলীল লেখকের প্রতিও তিনি অভিসম্পাত করেছেন।

সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছেঃ এরা সবাই গোনাহে সমান অংশীদার। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সাক্ষ্যদাতা ও দলীল লেখকের প্রতি অভিসম্পাত তখন যখন তারা জানে যে, এটা সুদের ব্যবসা।

৪. রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেনঃ চার ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন না এবং জান্নাতের নিয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করতে দেবেন না। এ চার ব্যক্তি হলঃ (১) মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, (২) সুদ-খোর, (৩) অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভক্ষণকারী এবং (৪) পিতামাতার অবাধ্যতা-কারী।---(মুস্তাদরাক-হাকেম)

৫. নবী-করীম (সা) বলেন, এক দিরহাম সুদ খাওয়া সত্তর বার ব্যভিচার করার চাইতে বড় গোনাহ্। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হারাম মাল দ্বারা যে মাংস গঠিত হয়, তার জন্য আগুনই যোগ্য। এরই সাথে কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, কোন মুসলমানের মানহানি করা সুদের চাইতেও কঠোর গোনাহ্। ---(মসনদে আহ্মদ, তিবরানী)

৬. ব্যবহারযোগ্য হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করতে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন ঃ কোন জনপদে যখন ব্যভিচার ও সুদের ব্যবসায় প্রসার লাভ করে, তখন সে জনপদ যেন আল্লাহ্র শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানায়। ---(মুস্তাদরাক-হাকেম)

৭. রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদের লেনদেন প্রচলিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতি ঘটান এবং যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুষ ব্যাপক হয়ে যায়, তখন তাদের উপর শত্রুর ভয়ও প্রাধান্য ছায়াপাত করে। ----(মসনদে আহ্মদ)

৮. রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ মি'রাজের রাত্রে যখন আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম, তখন আমি উপরে বজ্র ও বিদ্যুৎ দেখলাম। এরপর আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম, যাদের পেট একেকটি ঘরের ন্যায় ফোলা ও বিস্তৃত ছিল। তাদের উদর সর্প দ্বারা ভর্তি ছিল। সর্পগুলো বাইরে থেকেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এরা কারা ? তিনি বললেন ঃ এরা সুদখোর। —(মসনদে আহ্মদ)

৯. রসূলুল্লাহ্ (সা) আওফা ইবনে মালেক (রা)-কে বললেন, যেসব গোনাহ্ মাফ করা হয় না, সেগুলো থেকে বেঁচে থাক। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে যুদ্ধলব্ধ মাল চুরি করা ও অপরটি সুদ খাওয়া।---(তিবরানী)

১০. রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তিকে তুমি কর্জ দিয়েছ, তার হাদিয়াও গ্রহণ করো না। সে কর্জের বিনিময়ে হাদিয়া দিতে পারে; এমতাবস্থায় তা সুদ হবে। এ কারণে তার হাদিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারেও সাবধান হওয়া উচিত।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۖ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا
فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا
دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ
ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى
اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا
فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ
بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا
فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى
اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ
وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝ ع

(২৮২) হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে। লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ্ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেওয়া। এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশকম না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজের লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। দু'জন সাক্ষী কর

তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর—যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা একে লিখতে অলসতা করো না, তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধ করা আল্লাহ্‌র কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক অধিক সুষ্ঠু রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পরে হাতে হাতে আদান-প্রদান কর তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা হোক। যদি তোমরা এরূপ কর তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।

(২৮৩) আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করা! তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে খুব জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান করবে (মূল্য বাকী থাকুক কিংবা যে বস্তু ক্রয় করবে, তা হাতে পাওয়ার আগে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করার অবস্থায়) তখন তা (অর্থাৎ ঋণ আদান-প্রদানের দলীল-দস্তাবেজ) লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের (পরস্পর) মধ্যে (যে) কোন লেখক (হোক, সে) ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে (অর্থাৎ কারও খাতির করে বিষয়বস্তুর মধ্যে হেরফের করবে না) এবং লেখক লিখতে অস্বীকারও করবে না যেমন আল্লাহ্ তাকে (লেখা) শিক্ষা দান করেছেন তার উচিত লিখে দেওয়া এবং (লেখককে) ঐ ব্যক্তি (বলে দেবে এবং) লেখাবে যার দায়িত্বে ঋণ ওয়াজিব থাকবে। (কেননা, দলীল-দস্তাবেজের সারকথা ধারের স্বীকারোক্তি। কাজেই যার দায়িত্বে ধার, তার স্বীকারোক্তিই জরুরী)। আর (লেখানোর সময়) সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং এর (ঋণের) মধ্যে বলতে গিয়ে যেন কণামাত্রও ত্রুটি না করে। অতঃপর যার দায়িত্বে ঋণ, সে যদি দুর্বলবুদ্ধি (অর্থাৎ নির্বোধ কিংবা পাগল) হয় অথবা দুর্বল দেহ (অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা অক্ষম বৃদ্ধ) হয় অথবা (অন্য কোন কারণে) নিজে বর্ণনা করার (ও লেখানোর) শক্তি না রাখে (উদাহরণত সে মূক—লেখক তার ইশারা-ইঙ্গিত বুঝে

না অথবা সে ভিন্ন দেশের অধিবাসী এবং ভিন্নভাষী---লেখক তার ভাষা বুঝে না), তবে (এমতাবস্থায়) তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখিয়ে দেবে এবং তোমাদের পুরুষের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী (-ও) করে নেবে। (শরীয়ত মতে দাবী প্রমাণের আসল ভিত্তিই হচ্ছে সাক্ষী। দলীল-দস্তাবেজ না থাকলেও তাতে আসে যায় না। কিন্তু সাক্ষী ছাড়া শুধু দলীল-দস্তাবেজ এ জাতীয় ব্যাপারে ধর্তব্য নয়। স্মরণ রাখার সুবিধার্থে দলীল লেখা হবে। কেননা, লিখিত বিষয় দেখে ও শুনে স্বভাবতই পূর্ণ ঘটনা মনে পড়ে যায়। যেমন, কোরআনেই সত্বর তা বর্ণিত হবে ঃ (অতঃপর যদি দু'জন পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না যায়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী নিযুক্ত হবে,) ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা (নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে) পছন্দ কর (এবং একজন পুরুষের স্থলে দু'জন মহিলা এ কারণে প্রস্তাব করা হয়েছে) যাতে দু'জন মহিলার মধ্যে কোন একজনও (সাক্ষ্যের কোন অংশ মনে করতে কিংবা বর্ণনা করতে) ভুলে গেলে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয় (এবং স্মরণ করানোর পর সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু পূর্ণ হয়ে যায়) এবং যখন (সাক্ষী হওয়ার জন্য) ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদেরও অস্বীকার না করা উচিত। (কারণ, এভাবে স্বীয় ভাইয়ের সাহায্য হয়) এবং তোমরা এ (ঋণ)-কে (বারবার) লিখতে বিরক্তিবোধ করো না, তা (ঋণের ব্যাপারে) ছোট হোক কিংবা বড় হোক। এ লিপিবদ্ধ করা আল্লাহ্‌র কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে এবং সাক্ষ্যকে সুষ্ঠু রাখে এবং (লেনদেন সম্পর্কে) তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। (তাই লিপিবদ্ধ করাই ভাল) কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের মধ্যে কোন নগদ লেনদেন কর, তবে তা লিখলে তোমাদের উপর কোন অভিযোগ (ও ক্ষতি) নেই এবং (এতেও এতটুকু অবশ্যই করবে যে, এরূপ) ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ (সম্ভবত আগামীকাল কোন ব্যাপার হয়ে যাবে। উদাহরণত বিক্রেতা বলতে পারে যে, সে মূল্যই পায়নি কিংবা এ বস্তু সে বিক্রয়ই করেনি। অথবা ক্রেতা বলতে পারে যে, সে বিক্রীত বস্তু ফেরতদানের ক্ষমতাও নিয়েছিল কিংবা এখন পর্যন্ত বিক্রীত বস্তু পুরোপুরি তার হস্তগত হয়নি) এবং (আমি পূর্বে যেমন লেখক ও সাক্ষীকে লেখা ও সাক্ষ্যদানে অস্বীকার করতে নিষেধ করেছি, তেমনিভাবে তোমাদেরকেও জোরের সাথে বলছি যে, তোমাদের পক্ষ থেকে) কোন লেখক ও সাক্ষীকে কষ্ট না দেওয়া উচিত। (উদাহরণত নিজের কোন উপকারের জন্য তাদের উপকারে বিঘ্ন সৃষ্টি করা)। আল্লাহ্‌কে ভয় কর (যেসব কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন, তা করো না) এবং আল্লাহ্ তা'আলা (অর্থাৎ তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ এই যে,) তোমাদেরকে (প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান) শিক্ষাদান করে এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। (তিনি অনুগত ও অবাধ্যকেও জানেন---প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন)। এবং যদি তোমরা ঋণের লেনদেন করার সময়) প্রবাসে থাক এবং (দলীল-দস্তাবেজ লেখার জন্য সেখানে) কোন লেখক না পাও, তখন (স্বস্তিলাভের উপায়) বন্ধকী বস্তু, যা (দেনাদারের পক্ষ থেকে) ঋণদাতার অধিকারে দিয়ে দেওয়া হবে এবং যদি (এ সময়ও) একে অন্যকে বিশ্বাস করে (এবং অন্যকে বন্ধক রাখার প্রয়োজন মনে না করে,) তবে যাকে বিশ্বাস করা হয় (অর্থাৎ দেনাদার) তার উচিত অন্যের প্রাপ্য (পুরোপুরি) পরিশোধ

করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করা (এবং তার প্রাপ্য আত্মসাৎ না করা) এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না এবং যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে খুব পরিজ্ঞাত (অতএব, কেউ গোপন করলে আল্লাহ্ তা'আলার তা জানা থাকবে। তিনি শাস্তি দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধার-কর্জের ক্ষেত্রে দলীল লেখার নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি ঃ আলোচ্য আয়াত-সমূহে লেনদেন সম্পর্কিত আইনের জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। এক কথায় এটাকে চুক্তিনামা বলা যেতে পারে। এরপর সাক্ষ্য-বিধির বিশেষ ধারা উল্লিখিত হয়েছে।

আজকাল লেখালেখির যুগ। লেখাই মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি চৌদ্দশত বছর পূর্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তখন দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে মুখেই চলতো। লেখালেখি এবং দলীল-দস্তাবেজের প্রথা-প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম কোরআন পাক এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছে ঃ

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ---অর্থাৎ "তোমরা যখন পরস্পরের নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ধার-কর্জের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও।"

এতে প্রথম নীতি এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ধার-কর্জের লেনদেনে দলীল-দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করা উচিত---যাতে ভুল-ভ্রান্তি অথবা কোন পক্ষ থেকে অস্বীকৃতির কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে।

দ্বিতীয় মাস'আলা বর্ণিত হয়েছে যে, ধার-কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কর্জের লেনদেন জায়েয নয়। কেননা, এতে কলহ-বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ কারণেই ফিকহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ মেয়াদও এমন নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। মাস এবং দিন-তারিখসহ নির্দিষ্ট করতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ, যেমন 'ধান কাটার সময়' নির্ধারিত করা যাবে না। কেননা, আবহাওয়ার পরিবর্তনে ধান কাটার সময় আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে। যেহেতু সে যুগে লেখার ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং আজও ব্যাপক প্রচলনের পর পৃথিবীর অধিকাংশ লোক লেখা জানে না, তাই আশংকা ছিল যে, লেখক কিসের স্থলে কি লিখে ফেলবে! ফলে কারও ক্ষতি এবং কারও লাভ হয়ে যাবে। এ আশংকার কারণেই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ---অর্থাৎ এটা জরুরী যে, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে।

এতে একদিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, লেখক কোন একপক্ষের লোক হতে পারবে না; বরং নিরপেক্ষ হতে হবে---যাতে কারও মনে সন্দেহ বা খট্‌কা না থাকে।

অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার করে নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না।

এরপর দলীল কোন্ পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ---অর্থাৎ যার দায়িত্বে দেনা, সে লেখাবে।

উদাহরণত এক ব্যক্তি সওদা কিনে মূল্য বাকী রাখলো। এখানে যার দায়িত্বে দেনা হচ্ছে, সে দলীলের বিষয়বস্তু লেখাবে। কেননা, এটা হবে তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি বা অঙ্গীকার পত্র। লেখানোর মধ্যেও কমবেশীর আশংকা থাকতে পারে। তাই বলা হয়েছে ঃ

وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا---অর্থাৎ সে তার পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করবে এবং দেনা বিন্দুমাত্রও কম লেখাবে না। লেনদেনের ব্যাপারে দেনাদার ব্যক্তি কখনও নির্বোধ অথবা অক্ষম, বৃদ্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, মূক অথবা অন্য ভাষাভাষী হতে পারে। এ কারণে দলীলের বিষয়বস্তু বলে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তাই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার পক্ষ থেকে তার কোন অভিভাবক লেখাবে। পাগল ও নাবালেগের তো অভিভাবক থাকেই। তাদের সব কাজ-কারবার অভিভাবক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মূক এবং অন্য ভাষাভাষীর অভিভাবকও এ কাজ করতে পারে। যদি তারা কাউকে উকিল নিযুক্ত করে, তাতেও চলবে। এ স্থলে কোরআন পাকের 'ওলী' শব্দটি উভয় অর্থই বোঝায়।

সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী মূলনীতি ঃ এ পর্যন্ত লেনদেনে দলীল লেখা ও লেখানোর জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, দলীলের লেখাকেই যথেষ্ট মনে করবে না; বরং এতে সাক্ষীও রাখবে--যাতে কোন সময় পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফয়সালা হতে পারে। এ কারণেই ফিকহ্-বিদগণ বলেছেন যে, লেখা শরীয়তসম্মত প্রমাণ নয়, তাই লেখার সমর্থনে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকলে শুধু লেখার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা যায় না। আজকালকার সাধারণ আদালতসমূহেও এ রীতিই প্রচলিত রয়েছে। লেখার মৌখিক সত্যায়ন ও তৎসমর্থনে সাক্ষ্য ব্যতীত কোন ফয়সালা করা হয় না।

সাক্ষী সংখ্যা ঃ এরপর সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণত (১) সাক্ষী দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হওয়া জরুরী। একা একজন পুরুষ অথবা শুধু দু'জন মহিলা সাধারণ লেনদেনের সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট নয়।

সাক্ষীদের শর্তাবলী ঃ (২) সাক্ষীকে মুসলমান হতে হবে। مِنْ رِّجَالِكُمْ

শব্দে এদিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। (৩) সাক্ষীকে নির্ভরযোগ্য 'আদিল' হতে হবে, যার কথার উপর আস্থা রাখা যায়। ফাসেক ও ফাজের (অর্থাৎ পাপাচারী) হলে চলবে না। مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে।

শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা গোনাহ্ঃ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যখন কোন ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী করার জন্য ডাকা হয়, তখন সে যেন আসতে অস্বীকার না করে। কেননা, সাক্ষ্যই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিবাদ মেটানোর উপায় ও পন্থা। কাজেই একে জরুরী জাতীয় কাজ মনে করে কষ্ট স্বীকার করবে। এরপর আবার লেনদেনের দলীল লিপিবদ্ধ করার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছেঃ লেন-দেন ছোট হোক কিংবা বড় হোক--সবই লিপিবদ্ধ করা দরকার। এ ব্যাপারে বিরক্তিবোধ করা উচিত নয়। কেননা, লেনদেন লিপিবদ্ধ করা সত্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে, নির্ভুল সাক্ষ্য দিতে এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকতে চমৎকাররূপে সহায়তা করে। হ্যাঁ, যদি নগদ লেনদেন হয়---বাকী না হয়, তবে তা লিপিবদ্ধ না করলেও ক্ষতি নেই। তবে এ ব্যাপারেও কমপক্ষে সাক্ষী রাখা বান্ছনীয়। কেননা, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সময় মত-বিরোধ দেখা দিতে পারে। উদাহরণত বিক্রেতা মূল্য প্রাপ্তি অস্বীকার করতে পারে কিংবা ক্রেতা বলতে পারে যে, সে ক্রীতবস্তু বুঝে পায়নি। এ মতবিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য কাজে লাগবে।

সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করার মূলনীতিঃ আয়াতের শুরুতে লেখকদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন লিখতে ও সাক্ষী হতে অস্বীকার না করে। এমতাবস্থায় তাদেরকে হয়তো মানুষ বিরক্ত করে তুলতে পারতো। তাই আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছেঃ

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيدٌ অর্থাৎ কোন লেখক বা সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না করা হয়। অর্থাৎ নিজের উপকারের জন্য যেন তাদের বিব্রত না করা হয়। এরপর বলা হয়েছেঃ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ---অর্থাৎ তোমরা যদি লেখক বা সাক্ষীকে বিব্রত কর, তবে এতে তোমাদের গোনাহ্ হবে।

এতে বোঝা গেল যে, লেখক কিংবা সাক্ষীকে বিব্রত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম। এ কারণেই ফকীহ্গণ বলেনঃ লেখক যদি লেখার পারিশ্রমিক দাবী করে কিংবা সাক্ষী যাতায়াত খরচ চায়, তবে এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। তা না দেওয়াও তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত করার শামিল এবং অবৈধ। ইসলাম বিচার ব্যবস্থায় যেমন সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছে এবং সাক্ষ্য গোপন করাকে কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, তেমনি এ ব্যবস্থাও করেছে, যাতে কেউ সাক্ষ্য দেওয়া থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য না হয়। এ দ্বিমুখী সতর্কতার ফলেই প্রত্যেক মামলায় সত্যবাদী ও নিঃস্বার্থ সাক্ষী পাওয়া যেত এবং নিষ্পত্তি

দ্রুত, সহজ ও ন্যায়ানুগ হতো। বর্তমান বিশ্ব এ কোরআনী নীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। ফলে সমগ্র বিচার ব্যবস্থা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। ঘটনার আসল ও সত্য সাক্ষী পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই সাক্ষ্যদান থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ এই যে, যার নাম সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়, পুলিশী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা হলে রোজই সময়ে-অসময়ে থানা পুলিশ তাদের ডেকে পাঠায়। মাঝে মাঝে কয়েক ঘন্টা বসিয়ে রাখে। দেওয়ানী আদালতসমূহেও সাক্ষীর সাথে অপরাধীর মত ব্যবহার করা হয়। এরপর রোজ রোজ মোকদ্দমার হাযিরা পরিবর্তিত হয়। তারিখের পর তারিখ পড়ে। বেচারা সাক্ষী নিজ কাজ-কারবার, মজুরি কিংবা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। তান্যথা হলে পরোয়ানা জারি করে গ্রেফতার করা হয়। তাই কোন ভদ্র ও ব্যস্ত মানুষ কোন মামলার সাক্ষী হওয়াকে আযাব বলে মনে করে এবং যথাসাধ্য এ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। তবে শুধু পেশাদার সাক্ষীই এসব ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যাদের কাছে সত্য-মিথ্যার কোন পার্থক্য নেই। কোরআন পাক এ সম্পর্কিত মৌলিক প্রয়োজনাদি গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করে এসব অনিষ্টের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ - وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ০---অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নির্ভুল নীতি শিক্ষা দেন। এটা তাঁর অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত। এ আয়াতে অনেক বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন ফিকহ্‌বিদ এ আয়াত থেকে বিশটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা বের করেছেন। কোরআন পাকের সাধারণ রীতি এই যে, আইন বর্ণনা করার আগে ও পরে আল্লাহ্-ভীতি ও প্রতিদান দিবসের ভীতি স্মরণ করিয়ে মানুষের মনকে নির্দেশ পালনে উদ্বুদ্ধ করে। এই রীতি অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত আল্লাহ্-ভীতি দ্বারা শেষ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে কোন কিছু গোপন নয়। তোমরা যদি কোন অবৈধ বাহানার মাধ্যমেও বিরুদ্ধাচরণ কর, তবুও আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দিতে পারবে না।

দ্বিতীয় আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত বাকীর ব্যাপারে যদি কেউ বিশ্বস্ততার জন্য কোন বস্তু বন্ধকে নিতে চায়, তাও করতে পারে। কিন্তু এতে مَقْبُوضَةٌ শব্দ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বন্ধকী বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্য জায়েয নয়। সে শুধু ঋণ পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত একে নিজের অধিকারে রাখবে। এর যাবতীয় মুনাফা আসল মালিকের প্রাপ্য।

দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি কোন বিরোধ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান রাখে, সে সাক্ষ্য গোপন করতে পারবে না। যদি সে গোপন করে, তবে তার অন্তর গোনাহ্‌গার হবে। 'অন্তর গোনাহ্‌গার বলার কারণ এই যে, কেউ যেন একে শুধু মুখের গোনাহ্ মনে না করে। কেননা, অন্তর থেকেই প্রথমে ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। তাই অন্তরের গোনাহ্ প্রথম।

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ
اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۭ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(২৮৪) যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে, সব আল্লাহ্‌রই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যা কিছু যমীনের বুকে রয়েছে, সব (সৃষ্ট বস্তু) আল্লাহ্‌রই। (যেমন, স্বয়ং আসমান এবং যমীন তাঁরই। তিনি যখন মালিক, তখন স্বীয় মালিকানাধীন বস্তুসমূহের জন্য সর্বপ্রকার আইন রচনা করার অধিকার তাঁরই রয়েছে। এতে কারও কথা বলার অবকাশ নেই। উদাহরণত এক আইন এই যে,) তোমাদের অন্তরে যেসব (ভ্রান্ত বিশ্বাস, অশালীন চরিত্র কিংবা পাপ কাজের ইচ্ছা ও কৃতসংকল্প হওয়া সম্পর্কিত) বিষয় আছে, সেগুলোকে যদি তোমরা (মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে) প্রকাশ কর (উদাহরণত মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণ কর কিংবা অহংকার, হিংসা ইত্যাদি প্রকাশ কর বা যে পাপ কাজ করার ইচ্ছা ছিল, তা করেই ফেল) অথবা (মনের মধ্যেই) গোপন রাখ, (উভয় অবস্থাতে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছ থেকে (অন্যান্য পাপ-কাজের মত সেগুলোর) হিসাব গ্রহণ করবেন। অনন্তর (হিসাব গ্রহণের পর কুফর ও শির্‌ক ছাড়া) যাকে (ক্ষমা করার) ইচ্ছা, ক্ষমা করবেন এবং যাকে (শাস্তি দেওয়ার) ইচ্ছা, শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়েই পরিপূর্ণ শক্তিমান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে সাক্ষ্য প্রকাশ করার নির্দেশ ও গোপন করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত সেই বিষয়বস্তুরই পরিশিষ্ট। এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, সাক্ষ্য গোপন করা হারাম। তোমরা যদি ঘটনা জেনেও তা গোপন কর, তবে সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ এর হিসাব গ্রহণ করবেন। এ ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইকরামা (রা), শা'বী (র) ও মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী)

শাব্দিক ব্যাপকতার দিক দিয়ে আয়াতটি ব্যাপক এবং যাবতীয় বিশ্বাস, ইবাদত ও লেনদেন এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-র প্রসিদ্ধ উক্তি তাই। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সকল সৃষ্টির যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব গ্রহণ করবেন। যে কাজ করা হয়েছে এবং যে কাজের শুধু মনে মনে সংকল্প করা হয়েছে, সে সবগুলোরই হিসাব গ্রহণ করবেন। বোখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর ভাষ্যে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন মু'মিনকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটবর্তী করা হবে এবং আল্লাহ্ তাকে এক এক করে সব গোনাহ্ স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করবেন ঃ এ গোনাহ্টি কি তোমার জানা আছে ? মু'মিন স্বীকার করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ আমি দুনিয়াতেও তোমার গোনাহ্ জনসমক্ষে প্রকাশ করিনি, আজও তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর নেক কাজের আমলনামা তার হাতে অর্পণ করা হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিকদের পাপকাজসমূহ প্রকাশ্যে বর্ণনা করা হবে।

অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ আজকের দিনে গোপন বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হবে এবং গোপন ভেদ প্রকাশ করা হবে। আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ শুধু তোমাদের প্রকাশ্য গোনাহ্সমূহ লিপিবদ্ধ করেছে। আমি এমন সব বিষয়ও জানি, যা ফেরেশতারা জানে না। এগুলো তারা তোমাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করেনি। এখন আমি বর্ণনা করছি এবং হিসাব নিচ্ছি। আমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করব এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। অতঃপর মু'মিনদেরকে ক্ষমা করা হবে এবং কাফিরদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। ---(কুরতুবী)

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

ان الله تجاوز عن امتى عما حدثت انفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به (قرطبى)

"আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ঐসব বিষয় ক্ষমা করেছেন, যা তাদের মনের কল্পনায় সীমাবদ্ধ থাকে---মুখে ব্যক্ত করে না অথবা কার্যে পরিণত করে না।"

এতে বোঝা যায় যে, মনের ইচ্ছার জন্য কোনরূপ শাস্তি দেওয়া হবে না। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ এ হাদীসটি জাগতিক বিধি-বিধান সম্পর্কিত। তালাক, ক্রীতদাস মুক্ত-করণ, কেনা-বেচা, দান ইত্যাদি শুধু মনে মনে ইচ্ছা করলেই হয় না, যে পর্যন্ত মুখে প্রকাশ কিংবা কার্যে পরিণত করা না হয়। আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা পারলৌকিক বিধি-বিধান সম্পর্কিত। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এবং হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা যায় না।

এ প্রশ্নের জওয়াবে আলেমগণ বলেন ঃ যে হাদীসে অন্তরের গোপন বিষয় ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে, সে হাদীসের অর্থ হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তা ও কুধারণা। যেগুলো কোনরূপ ইচ্ছা ছাড়াই মনে জাগরিত হয়। অনেক সময় বিপরীত ইচ্ছা করলেও এগুলো মনে জাগ্রত হতে থাকে। এ উম্মতের এ জাতীয় অনিচ্ছাকৃত কুধারণা ও কুমন্ত্রণা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করেছেন। পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াতে ঐ সব ইচ্ছা ও নিয়ত

বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ স্বেচ্ছায় অন্তরে পোষণ করে এবং তা কার্যে পরিণত করার চেষ্টাও করে। এরপর ঘটনাক্রমে কিছু বাধার সম্মুখীন হওয়ার কারণে কার্যে পরিণত করতে পারে না। কিয়ামতের দিন এ জাতীয় ইচ্ছা ও নিয়তের হিসাব নেওয়া হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন ; যেমন পূর্বোল্লিখিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের ভাষায় ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় প্রকার ধারণা অন্তর্ভুক্ত। তাই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায়ে-কিরাম অত্যধিক চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। তাঁরা ভাবতে থাকেন যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কুচিন্তার জন্যও যদি পাকড়াও করা হয়, তবে কারো পক্ষে কি মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে? তাঁরা এ ভাবনার কথা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করলেন। তিনি বললেন ঃ যে নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তা মেনে নিতে কৃতসংকল্প হও এবং বল ঃ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا—অর্থাৎ আমরা নির্দেশ শুনলাম ও মেনে নিলাম। সাহাবায়ে-কিরাম তাই করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে সামর্থ্যের বাইরে কার্যভার অর্পণ করেন না।

এর সারমর্ম এই যে, অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। এরপর সাহাবায়ে-কিরাম স্বস্তি লাভ করেন। এ হাদীসটি মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে-আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে।---(কুরতুবী)

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যেসব কাজ ফরয কিংবা হারাম করা হয়েছে, তন্মধ্যে কিছু মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ এবং চুরি, জেনা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কিছু কাজ মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, ঈমান ও বিশ্বাসের যাবতীয় শাখা-প্রশাখা। কুফর ও শিরক সর্বাধিক হারাম ও অবৈধ। এগুলোও মানুষের অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। উত্তম চরিত্র ; যথা—বিনয়, ধৈর্য, অল্পে তুষ্টি, দানশীলতা ইত্যাদি। এমনিভাবে কুচরিত্র ; যেমন—হিংসা, শত্রুতা, দুনিয়া-প্রীতি, লোভ ইত্যাদি অকাট্য হারাম বিষয়গুলোর সম্পর্কও মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে নয়, বরং অন্তরের সাথে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতে যেমন বাহ্যিক কাজ-কর্মের হিসাব গ্রহণ করা হবে, তেমনিভাবে অভ্যন্তরীণ কাজ-কর্মেরও হিসাব নেওয়া হবে এবং ভুল-ত্রুটির কারণেও পাকড়াও করা হবে। আয়াতটি সূরা বাক্কারার শেষভাগে বর্ণনা করার মধ্যে বিরাট রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে। কেননা, সূরা বাক্কারা কোরআন পাকের সর্বাপেক্ষা বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সূরা। খোদায়ী বিধি-বিধানের বিরাট অংশ এতে বিবৃত হয়েছে। এ সূরায় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ও আনুষঙ্গিক এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নির্দেশাবলী ; যথা—নামায, যাকাত, রোযা, কিসাস, হজ্জ, জিহাদ, পবিত্রতা, তালাক ইদ্দত, খুলা, শিশুকে দুগ্ধপান করানো, মদ ও সূদের অবৈধতা, ঋণ, লেনদেনের বৈধ ও অবৈধ পন্থা

ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই হাদীসে এ সূরার নাম 'সেনামুল-কোরআন' অর্থাৎ 'কোরআনের সর্বোচ্চ অংশ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে 'ইখলাস' বা আন্তরিক নিষ্ঠা। অর্থাৎ কোন কাজ করা কিংবা কোন কাজ থেকে বিরত থাকা খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই হতে হবে। এতে নাম-যশ অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য শামিল থাকতে পারবে না।

'ইখলাস' বা অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব কাজ-কর্মের বিশুদ্ধতা এরই উপর নির্ভরশীল। তাই সূরার শেষে এ আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, ফরয কাজ করা এবং হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে মানুষের সামনে তো প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে গা বাঁচানো যায়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী। তাঁর দৃষ্টিতে কোন কিছু গোপন নয়। তাই যা কিছু করবে, এ প্রত্যয়ের সাথে করবে যে, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব অবস্থাই লিপিবদ্ধ করছেন। কিয়ামতের দিন সবগুলোরই হিসাব দিতে হবে।

কোরআন পাক মানুষের মধ্যে এ অনুভূতিই সৃষ্টি করতে চায়। তাই প্রত্যেক বিধি-নিষেধের শুরুতে কিংবা শেষে খোদাভীতি ও আখেরাতের চিন্তার মতো এমন একটা অনুভূতির সৃষ্টি করে দেয়, যা মানুষের অন্তরে অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করতে থাকে। তাই মানুষ রাতের আঁধারে কিংবা নির্জনেও কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে ভয় পায়।

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ
كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا
أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ
وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

(২৮৫) রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে, যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (২৮৬) আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তে যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ। হে আমাদের প্রভো! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিয়ো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

রসূল (সা) বিশ্বাস রাখেন ঐসব বিষয় সম্পর্কে (অর্থাৎ বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে) যা তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ কোরআন) এবং (অন্য) মু'মিনরাও (এ বিশ্বাস রাখে। অতঃপর কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশ্বাস রাখলে কোরআনে বিশ্বাস রাখা বলা হবে, এর বিবরণ দান করা হয়েছে) সবাই (রসূল ও অন্য মু'মিনগণও) বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি (যে, তিনি বিদ্যমান আছেন; তিনি এক এবং সত্তা ও গুণাবলীতে সম্পূর্ণ।) এবং তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি এবং তাঁর ঐশী গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি (যে, তাঁরা পয়গম্বর এবং সত্যবাদী। পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস রাখা এভাবে যে, তারা বলে,) আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কারও সাথে (বিশ্বাস রাখার ব্যাপারে) পার্থক্য করি না (যে, কাউকে পয়গম্বর মনে করবো এবং কাউকে মনে করবো না) তারা সবাই বলে যে, আমরা (আপনার নির্দেশ) শুনেছি এবং (এগুলো) সানন্দে মেনে নিয়েছি। আমরা আপনার ক্ষমা কামনা করি যে, আপনি আমাদের পালনকর্তা এবং আপনারই দিকে (আমাদের সবাইকে) প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (অর্থাৎ আমি পূর্বের আয়াতে বলেছি যে, অন্তরের গোপন বিষয়াদিরও হিসাব গ্রহণ করা হবে, এর অর্থ অনিচ্ছাকৃত বিষয়াদি নয়; বরং শুধু ইচ্ছাধীন বিষয়াদি। কেননা,) আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে (শরীয়তের বিধি-বিধানের) দায়িত্ব ন্যস্ত করেন না (অর্থাৎ এসব বিধি-বিধানকে ওয়াজিব কিংবা হারাম করেন না) কিন্তু যা তার সাধ্যের (ও ক্ষমতার) মধ্যে থাকে। সে সওয়াবও তারই পায়, যা সে ইচ্ছাকৃতভাবে করে এবং

সে শাস্তিও তারই পাবে, যা সে স্বেচ্ছায় করে (এবং যা সাধ্যের বাইরে, সে বিষয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়নি। যে বিষয়ের সাথে ইচ্ছার সম্পর্ক নাই, তার জন্য সওয়াব ও শাস্তি কিছুই হবে না। কু-চিন্তা সাধ্যের বাইরে। তাই তার অন্তরে জাগরিত হওয়াকে হারাম এবং জাগরিত হতে না দেওয়াকে ওয়াজিব করেন নি এবং এর জন্য কোন শাস্তিই রাখেন নি)। হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে দায়ী করবেন না, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি। হে আমাদের প্রভো ! এবং (আমরা আরও প্রার্থনা জানাই যে,) আমাদের উপর (দায়িত্ব পালনের) এমন কোন গুরুভার (ইহকালে কিংবা পরকালে) অর্পণ করবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব, কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়ী করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বর্ণিত আয়াতদ্বয়ের বিশেষ ফযীলত ঃ আলোচ্য আয়াত দু'টি সূরা বাক্কারার শেষ আয়াত। সহীহ্ হাদীসসমূহে এ আয়াত দুটির বিশেষ ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কেউ রাতের বেলায় এ আয়াত দু'টি পাঠ করলে তা তার জন্য যথেষ্ট।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা---রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ দুটি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগৎ সৃষ্টির দু'ই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এশার নামাযের পর এ দু'টি আয়াত পাঠ করলে তা তাহাজ্জুদ নামাযের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। মুস্তাদ্‌রাক হাকেম ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'টি আয়াত দ্বারা সূরা বাক্কারা সমাপ্ত করেছেন। আরশের নিম্নস্থিত বিশেষ ভাণ্ডার থেকে এ দু'টি আয়াত আমাকে দান করা হয়েছে। তোমরা বিশেষভাবে এ দু'টি আয়াত শিক্ষা কর এবং নিজেদের স্ত্রীলোক ও সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দাও।

এ কারণেই হযরত ফারূকে আযম ও আলী মুর্তজা (রা) বলেন, আমাদের মতে যার সামান্যও বুদ্ধিজ্ঞান আছে, সে এ দুটি আয়াত পাঠ করা ব্যতীত নিদ্রা যাবে না। এ আয়াতদ্বয়ের অর্থগত বৈশিষ্ট্য অনেক। তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এই যে, সূরা বাক্কারার অধিকাংশ বিধি-বিধান সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যথা বিশ্বাস, ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র-সামাজিকতা ইত্যাদি। সর্বশেষ এ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে অনুগত মু'মিনদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় বিধান শিরোধার্য করে নিয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যা এ আয়াতদ্বয়ের পূর্ববর্তী আয়াতে সাহাবায়ে-কিরামের মনে দেখা দিয়েছিল। প্রশ্নটি ছিল এই ---যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ○---অর্থাৎ

'তোমাদের অন্তরে যা আছে, প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যেসব কাজ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার হিসাব নেবেন। অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এর অন্তর্ভুক্তই ছিল না। কিন্তু আয়াতের ভাষা বাহ্যত ব্যাপক ছিল। এতে বোঝা যেতো যে, অনিচ্ছাকৃত ধারণারও হিসাব নেওয়া হবে। এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে-কিরাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রসূল (সা)-এর কাছে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এতদিন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হবে। মনে যেসব অনিচ্ছাকৃত কল্পনা আসে, সেগুলোর হিসাব হবে না। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি কল্পনারও হিসাব হবে। এতে তো শাস্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়। মহানবী (সা) আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানতেন, কিন্তু উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না, বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সাহাবায়ে-কিরামকে আপাতত আদেশ দিলেন যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, তা সহজ হোক কিংবা কঠিন--মু'মিনের কাজ তো মেনে নেওয়া। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক আদেশ শুনে তোমাদের একথা বলা উচিত ঃ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ—

অর্থাৎ "হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রভো! যদি নির্দেশ পালনে আমাদের কোন ত্রুটি বা ভুল হয়ে থাকে, তবে তা ক্ষমা করুন। কেননা, আমাদের সবাইকে আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

সাহাবায়ে-কিরাম রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ নির্দেশ মত কাজ করলেন; যদিও তাঁদের মনে এ খটকা ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কুচিন্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ দুটি আয়াত নাযিল করেন। প্রথম আয়াতে মুসলমানদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যে আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে-কিরামের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। প্রথম আয়াতটি হচ্ছে ঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۔ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

অর্থাৎ রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ বিষয়ের প্রতি, যা তাঁর কাছে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মহানবী (সা)-র প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁর নাম

উল্লেখ করার পরিবর্তে 'রসূল' শব্দ ব্যবহার করে তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরপর বলেছেন ঃ وَالْمُؤْمِنُونَ অর্থাৎ রসূল (সা)-এর যেমন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রতি বিশ্বাস আছে, তেমনি সাধারণ মু'মিনদেরও রয়েছে। এতে প্রথমে পূর্ণ বাক্যে রসূল (সা)-এর বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে, এরপর মু'মিনদের বিশ্বাস পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বর্ণনা-ভঙ্গিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও আসল বিশ্বাসে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সকল মুসলমান অভিন্ন, কিন্তু বিশ্বাসের স্তরে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশ্বাস প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শ্রবণের ভিত্তিতে এবং অন্য মুসলমানগণের বিশ্বাস 'অদৃশ্য বিশ্বাস' এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখার ভিত্তিতে।

এরপর মহানবী (সা) ও অন্য মু'মিনদের অভিন্ন ও সংক্ষিপ্ত ঈমানের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি, পূর্ণতার যাবতীয় গুণে তাঁর গুণান্বিত হওয়ার প্রতি, ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি এবং আল্লাহ্ তা'আলার গ্রন্থাবলী ও পয়গম্বরগণের সকলেরই সত্য হওয়ার প্রতি।

এরপর বলা হয়েছে যে, এ উম্মতের মু'মিনগণ পূর্ববর্তী উম্মতগণের মত আল্লাহ্ তা'আলার পয়গম্বরগণের মধ্যে প্রভেদ করবে না যে, কাউকে পয়গম্বর মানবে এবং কাউকে মানবে না। যেমন, ইহুদীরা হযরত মূসা (আ)-কে এবং খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে পয়গম্বর মানে, কিন্তু শেষ নবী (সা)-কে পয়গম্বর মানে না। এ উম্মতের প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার কোন পয়গম্বরকে অস্বীকার করে না। এরপর সাহাবায়ে-কিরামের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুখে এ বাক্য বলেছিলেন ঃ

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ○

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ঐ সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াত থেকে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল যে, অন্তরের গোপন ধারণার জন্য দায়ী করা হলে আযাব থেকে কিরূপে বাঁচা যাবে! বলা হয়েছে لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কাজের আদেশ দেন না। কাজেই অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব কল্পনা ও কুচিন্তা অন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, এরপর সেগুলো কার্যে পরিণত করা না হয়, সেসব আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মাফ। যেসব কাজ ইচ্ছা করে করা হয়, শুধু সেগুলোরই হিসাব হবে।

এর বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, মানুষের যেসব কাজকর্ম হাত, পা, চক্ষু, মুখ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোকে 'বাহ্যিক কাজকর্ম' বলা হয়। এগুলো দু'প্রকার ঃ এক, ইচ্ছাধীন---যা ইচ্ছা করে করা হয়; যেমন ইচ্ছা করে কথা বলা, ইচ্ছা করে কাউকে প্রহার করা ইত্যাদি। দুই, অনিচ্ছাধীন, যা ইচ্ছা ছাড়াই ঘটে যায়। যেমন, এক কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা বলে ফেলা অথবা কাঁপুনি রোগে অনিচ্ছাকৃতভাবে হাত নড়ে

যাওয়ার কারণে কারও ক্ষতি হয়ে যাওয়া। এখানে লক্ষণীয়, বিশেষভাবে ইচ্ছাধীন কাজ-কর্মেরই হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তি হবে—অনিচ্ছাকৃত কাজের আদেশ মানুষকে দেওয়া হয়নি এবং সেজন্য সওয়াব বা আযাব হবে না।

এমনিভাবে যেসব কাজকর্ম মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোও দু'-প্রকার। এক, ইচ্ছাধীন। যেমন, ইচ্ছা করে অন্তরের কুফ্‌র ও শির্‌কের বিশ্বাস পোষণ করা কিংবা জেনে-বুঝে ইচ্ছা সহকারে নিজেকে বড় মনে করা অর্থাৎ অহংকার করা কিংবা মদ্যপানে কৃতসংকল্প হওয়া। দুই, অনিচ্ছাধীন। যেমন, ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মনে কুধারণা আসা। এ ক্ষেত্রেও হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তি শুধু ইচ্ছাধীন কাজের জন্যই হবে—অনিচ্ছাধীন কাজের জন্য নয়।

কোরআনে বর্ণিত এ ব্যাখ্যার ফলে সাহাবায়ে-কিরামের মানসিক উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। আয়াতের শেষে এই বিষয়বস্তুটি আরও ফুটিয়ে তোলার জন্য বলা হয়েছে ঃ

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ—অর্থাৎ মানুষ সওয়াবও সে কাজের জন্যই পাবে, যা স্বেচ্ছায় করে এবং শাস্তিও সে কাজের জন্যই পাবে যা স্বেচ্ছায় করে।

এখানে সন্দেহ দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের সওয়াব অথবা আযাব হয়, যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজ করে—যা দেখে অন্যরাও এ সৎকাজে উদ্বুদ্ধ হয়, যতদিন পর্যন্ত অন্যেরা এ সৎ কাজ করতে থাকবে, ততদিন এর সওয়াব প্রথম ব্যক্তিও পেতে থাকবে। এমনিভাবে, যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ প্রবর্তন করে, ভবিষ্যতে যত লোক এ পাপ কাজে লিপ্ত হবে, তাদের সমান পাপ প্রথম প্রচলনকারী ব্যক্তিরও হতে থাকবে। হাদীস দ্বারা আরও প্রমাণিত আছে যে, কেউ যদি নিজের সওয়াব অন্যকে দিতে চায়, তবে অন্য ব্যক্তি এ সওয়াব পায়। অতএব, বোঝা গেল যে, ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের সওয়াব কিংবা আযাব হয়।

এ সন্দেহ নিরসনকল্পে বলা যায় যে, প্রথমাবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে ঐ কাজের সওয়াব কিংবা আযাব হবে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে। অতএব, পরোক্ষভাবে এমন কোন কাজের সওয়াব কিংবা আযাব হওয়া এর পরিপন্থী নয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করেনি। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত-সমূহে একথা সুস্পষ্ট যে, প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সওয়াব কিংবা আযাব হয়নি, বরং অন্যের মধ্যস্থতায় হয়েছে। এছাড়া মধ্যস্থতার মধ্যে তার কার্য ও ইচ্ছার প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তি কারও উদ্ভাবিত ভাল কিংবা মন্দ পথ অবলম্বন করে তার মধ্যে প্রথম ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত কাজের প্রভাব থাকে ; যদিও প্রথম ব্যক্তি এ প্রভাবের ইচ্ছা করেনি। এমনিভাবে কেউ কোন ব্যক্তিকে সওয়াব তখনই পৌঁছায়, যখন সে তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করে থাকে। এ হিসাবে অপরের কাজের সওয়াব এবং আযাবও প্রকৃতপক্ষে নিজের কাজেরই সওয়াব ও আযাব।

উপসংহারে কোরআন পাক মুসলমানদেরকে একটি বিশেষ দোয়া শিক্ষা দিয়েছে। এতে ভুল-ভ্রান্তিবশত কোন কাজ হয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলা হয়েছে ঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا—"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দায়ী করো না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি।" এরপর বলা হয়েছে ঃ

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ০

অর্থাৎ "হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের (বনী ইসরাঈলদের) উপর অর্পণ করেছিলে এবং আমাদের উপর এমন ফরয কাজ আরোপ করো না, যা সম্পাদনের শক্তি আমাদের নেই।"

এর অর্থ সেসব কঠিন কাজ-কর্ম, যা বনী ইসরাঈলের উপর আরোপিত ছিল। যেমন, না-পাক বস্ত্র ধৌত করলে পাক হতো না, বরং না-পাক অংশ কেটে ফেলতে হতো কিংবা পুড়িয়ে ফেলতে হতো এবং নিজেকে হত্যা করা ব্যতীত তাদের তওবা কবুল হতো না। কিংবা অর্থ এই যে, দুনিয়াতে আমাদের উপর আযাব নাযিল করো না; যেমন বনী ইসরাঈলের কু-কর্মের জন্য আযাব নাযিল করেছ। এসব দোয়া যে আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেছেন, তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে প্রকাশও করেছেন।

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ۔

ইফাবা—২০০৪-২০০৫—প্র/ ১৪৮৪(উ)— ৫,২৫০